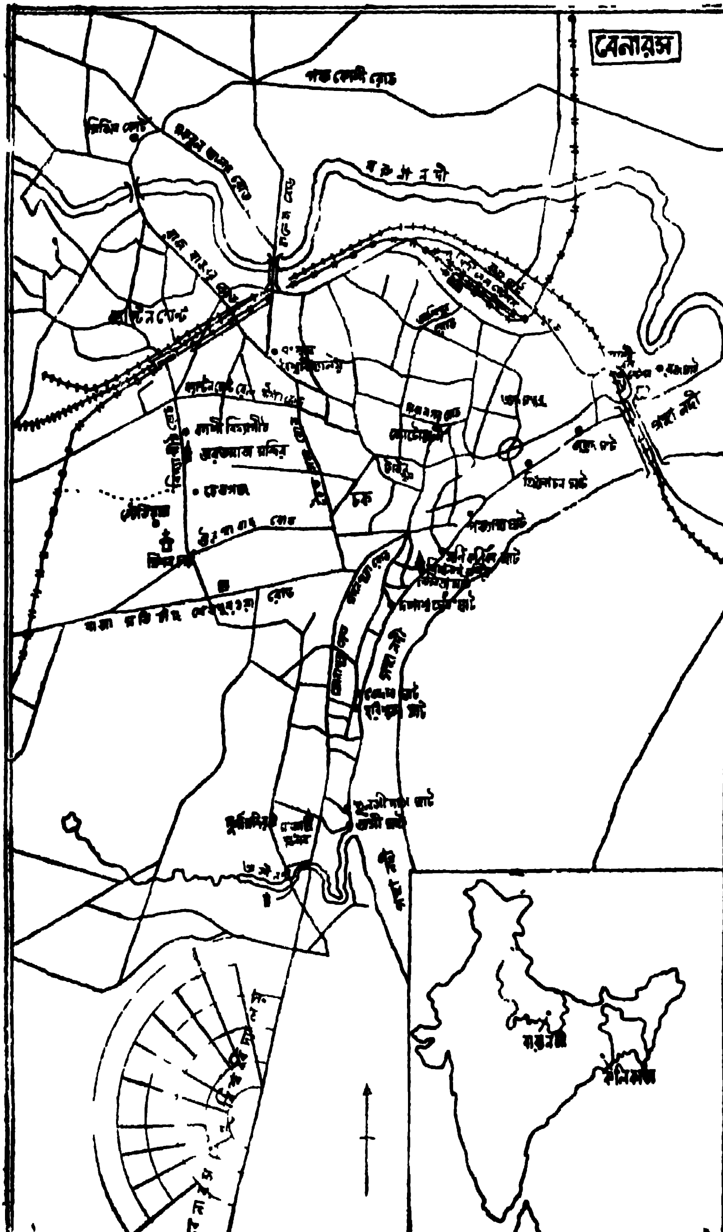
বার্ধক্যের বারাণসী

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

তিন সঙ্গী ।। ৫৭ সি.কলেজ স্ট্রীট ।। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ	:	অগাস্ট, ১৯৫২
		শ্রাবণ, ১৩৫৯
প্রকাশিকা	:	প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়
		তিন সঙ্গী
		৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট,
		কলকাতা-৭৩
মুদ্রক	:	শ্রীভজচন্দ্র রায়
		তারকেশ্বর প্রেস
		৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
		কলকাতা—৬
প্রচ্ছদ	:	প্রবীর সেন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
বীথি গঙ্গোপাধ্যায়
দাদা ও বৌদিকে—



বেনারস
চক
দশাশ্বমেধ ঘাট
গঙ্গা নদী

মহারাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিং নাছোড়বান্দা। তার একটাই কথা, বারাণসীতে এসে বেনারসী কালচারের স্বাদ পেতে হলে প্রিন্স অব ওয়েলসকে ইনডিয়ান ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শুনতেই হবে।

রাজধানী কলকাতা থেকে বড়লাটের রিপ্রেজেনটেটিভ এসেছেন কাশী-নরেশের দরবারে। প্রিন্স অব ওয়েলস কাশীতে আসছেন। বেড়াতে। অল ইনডিয়া ট্যুরের অঙ্গ। কাশীতে আসবেন। গঙ্গায় ঘুরবেন। ঘাট দেখবেন, মন্দির দেখবেন। হিন্দু কালচারের মক্কা কাশী সম্পর্কে খানিকটা আইডিয়া নেবেন। এর মধ্যে গান-বাজনা, বিশেষ করে ওই সব ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক-টিউজিকের স্কোপ কোথায়? না, না মহারাজ, এই গান-বাজনার ব্যাপারটা বাদ দিন।

পাকানো জোড়া গোঁফ এবং ঘনপক্ষ্ম ভ্রূজোড়ার মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠল কাশী-নরেশের সেই বিখ্যাত দুটি চোখ। চোখ তো নয়, দু'টুকরো গ্র্যানিট। ভারী গলার স্বর দরবার হলের পাথুরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে উঠল। কাশীতে এসে প্রিন্স অব ওয়েলস যদি আমার গেস্ট হোল, তাহলে তাঁকে অভ্যর্থনার দায় ও দায়িত্ব আমার ওপরই ছেড়ে দিন। নইলে আমায় রেহাই দিন।

এর পর আর কথা চলে না। তবে বড়লাটের রিকোয়েস্টও ফেলনা নয়। ঠিক হল, কাশী-নরেশের ইচ্ছা বজায় রেখে রাজকুমারকে আদৌ 'বোর' না করে দশ মিনিটের একটা প্রোগ্রাম হবে। ঠিক দশ মিনিট। তার বেশি এক মিনিটও নয়।

মহারাজা আর কোন কথা বললেন না। খবর গেল ডালমণ্ডীতে। বিখ্যাত বাঈজী বিদ্যাধরীকে মহারাজা স্বয়ং এত্তেলা দিয়েছেন। কাশীর সুনাম রক্ষার দায়িত্ব বিদ্যাধরীর।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে আসর বসল। বিশাল দরবার হল জুড়ে সারি সারি মেহগনি চেয়ার। প্রিন্স অব ওয়েলসের সঙ্গীরা, বড়লাটের লোকজন, কাশীর রইসরা সবাই উপস্থিত। পাশাপাশি দুটি রাজকীয় সিংহাসনে বসে ব্রিটিশ রাজকুমার ও কাশী-নরেশ। মাঝে মেঝেজোড়া কাশ্মীরে গালচের ওপর হরিণের চামড়ার সামনে ফুটন্ত গোলাপের মত বিদ্যাধরীকে ঘিরে সারেঙী, সাহনাই, তবলা, বীণা-বাদকের সারি। কাশী নরেশের নির্দেশে সোনার থালায় করে একটি সোনার ঘড়ি এনে রাজকুমারের সামনে রাখা হল। সকাল দশটা বেজে দশ। কাঁটা ঘুরে বিশের ঘরে গেলেই গান থামবে। বিদ্যাধরীর দুটি উর্বশী ঠোঁট উন্মুখ হল।

ঠিক দেড়ঘণ্টা পরে কাশী-নরেশ ফিসফিস করে রাজকুমারকে বললেন: ইওর হাইনেস, আপনার পরের দুটো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট অলরেডি ক্যানসেলড। আপনি কি আরো গান শুনবেন?

হিজ হাইনেস মৃদুকণ্ঠে শুধু জানতে চাইলেন: ইজ শী আ মরটাল বীইং অর আ ফেয়ারি?

কাশী-নরেশের দুটি চোখ কৌতুক রৌদ্রে ঝলমল করছে। হেসে বললেন: কাশীর বিখ্যাত বাঈজীদের কাউকেই আজ আনতে পারি নি। সকলেরই প্রিভিয়াস এনগেজমেণ্ট ছিল। বিদ্যাধরী ইজ আ টাইনি ওয়ান অ্যামঙ্গসট দ্য জায়েণ্টস।

ডঃ পটেকর থামলেন। বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির ইনডিয়ান ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের রিডার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে উপাচার্যের বাড়ির সামনে অন্যতম অতিথিশালা হোলকার হাউসের একতলার ছাদে বসে আমরা ডঃ পটেকরের গান সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো গল্প শুনছিলাম। আমরা বলতে কয়েকজন সাংবাদিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাগজ ও নিউজ এজেন্সি থেকে এসেছি কাশীতে। ডেভলপমেণ্ট জারনালিজমের ওয়ার্কশপ—তিনটি সপ্তাহ ধরে। উদ্যোক্তা প্রেস ইনসটিটিউট অব ইনডিয়া। খরচখরচা যোগাচ্ছে ইউ. এন. ও.।

সারাদিন ক্লাস করি। দিল্লী ও বেনারসের অধ্যাপকরা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। আমাদের কাজ লেকচার শোনার পর প্রশ্ন করা। এতে নাকি জ্ঞান বাড়ে। সাংবাদিক দক্ষতা শানানো ছুরি হয়ে যায়। রীতিমত বোরিং সব ব্যাপার-স্যাপার। একমাত্র রিলিফ সন্ধ্যাটা। তখন বি এইচ. ইউ-র অধ্যাপকরা আসেন। আয়ুর্বেদের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট ডাঃ দেশপাণ্ডে, সোসিওলজির শ্রীবাস্তব, জারনালিজমের হেড অঞ্জন ব্যানার্জী, শিক্ষক নেতা দীপক মল্লিক, কমুনিকেশনের অধ্যাপক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কাওলা, ডঃ পটেকর, স্থানীয দৈনিক 'আজ'-এর রিপোর্টার আশিস বাগচী, বারাণসী রেডিও স্টেশনের ডঃ মিশ্র এবং আরো অনেকে। চুটিয়ে চলে আড্ডা। সেই সঙ্গে ডঃ পটেকরের গান। আর সেই গানের তুলনা শুধু একটাই, বিলায়েতের বাজনা। কথায় কথায় কাশীর বাঈজীদের কথা উঠতেই ডঃ পটেকর একশ বছর আগের এই ঘটনাটি বলে থামলেন।

ঃ আজ কি আর বিদ্যাধরীরা নেই কাশীতে ?—জানতে চাইলাম।

ঃ হয়তো আছে, হয়তো নেই। কে আর তাদের খবর রাখে ? উদাস পটেকরের গলায ক্ষোভ, অভিমান। একটু থেমে বললেন, সবাই আজ ফিল্মী গান শুনতে চায়। চা-কফিখোররা কি রাবড়ি-মালাই-এর স্বাদ বোঝে ?

সকলের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, বাঈজীদের ডেরাডাণ্ডার কথা জানলেও সামাজিক মানহানির ভয়ে প্রকাশ্যে অন্ততঃ কেউ ও পাড়ার ঘাটও মাড়াতে চায় না। ইউ. পি.-র অন্যতম বড় শহর কাশী। আট লক্ষের ওপর বাসিন্দা। মন্দির, মসজিদ, ধর্মস্থান গিজগিজ করছে। তার ভেতর দিয়ে গঙ্গার স্রোতের মত বয়ে চলেছে হাজার ত্রিশেক সাইকেল রিক্শা, টাঙ্গা, স্কুটার-রিক্শা, ঢোলকম্বলের মত বেনারস নগরপালিকার বাস আর লাখ খানেক সাইকেল। গঙ্গার প্যারালাল লম্বাটে শহর। যেদিক দিয়েই যাই না কেন, ঘুরে ফিরে সেই

গোধুলিয়ার মোড় এসে যায়। গোধুলিয়ার বাঁ দিকে গির্জা চৌয়ানিয়া। ওই চৌয়ানিয়ার রাস্তার ডানহাতে ডালমণ্ডি।

পিচ রাস্তা শেষ। কাঁচা মাটির পথের মুখটা খানিকটা চওড়া। ওই রাস্তার ওপর কাটা কাপড়, শাড়ি, লুঙ্গির একেবারে হাওড়া হাট। হাট ছাড়াতেই সরু পাথুরে ইটে বাঁধানো গলি। সাইকেল, রিক্শা, মোটর সাইকেলে ঠাসাঠাসি। বাতাসে পরোটা আর মাংস। দু'দিকে জামাকাপড় আর খাওয়ার দোকান। যেন আধা বুড়ো ভিখারীর গায়ে ছেঁড়া জোববায় শীত দাঁত বসাচ্ছে। পানের দোকানী মঘাই পাতায় তিন রাউণ্ড কথার প্রলেপ মেখে খিলি মুড়তে মুড়তে বাঁ হাতের তেলোয় তুলে নিল আউন্সখানেক জরদা। শালপাতায় মোড়া খিলি আর জরদা নিয়ে খদ্দের আগের পানের পিক ছড়িয়ে দিল রাস্তায়। ডান হাতে পড়ল ক্রাউন লাজ। এরা লজকে বলে লাজ, কলেজকে কালেজ—ঠিক একশ বছর আগে বাঙালীরা যে উচ্চারণ করত এরা আজও সেই উচ্চারণে অটল।

লাজের দোতলায় থাকেন ডাঃ মহম্মদ নজির জাফরি। একতলায় চেমবার। ভি. ডি. স্পেশালিস্ট। উর্দু কবি। একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। বয়স পঁয়তাল্লিশের ঘাট সবে পেরিয়েছে।

পেশায় আমি পত্রকার, আরজি, যাব খানদানী বাইজী বাড়ি, শুনে ডাঃ জাফরি হেসে বললেন: বেশ তো, যাবেন। সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে সেই খানদান কি আর আছে?

: কেন, সব কি উঠে গেল?

: তাছাড়া উপায়। যারা এদের দেখাশোনা করত, এদের নাচগানের কদর করত তারা, সেই সব রাজা মহারাজা জমিদাররা আজ কোথায়?

: কিন্তু সেই ডালমণ্ডি তো আছে।

: আছে বই কি। তবে আজ অন্য পরিচয়ে—কাশীর রেড-লাইট এরিয়া। সামান্য কয়েকঘর বাঈজী এরই ভেতর কোন রকমে টিকে আছে।

ডাক্তার সাহেব সুপুরুষ। পাতলা সরু করে ছাঁটা গোঁফে, চোখের সুরমার টানে, প্রিপিস সুটে আমেজ স্পষ্ট। আমার প্রশ্নে যেন সেই আমেজের রেশ কেটে গেল। নড়ে-চড়ে উঠলেন: তোবা, তোবা। বাঈজী কি কখনো বেশ্যা হয়। বাঈজী গান গায়, নাচ দেখায়—দেহের কারবারী নয়।

: তাই যদি হবে তবে তাদের অস্পৃশ্যের মত ট্রিট করা হচ্ছে কেন ?

: কারণ একটিই—সমাজ। সব ভাল জিনিসই সময়ের টানে ক্ষয়ে যায়। ক্ষয়ে গেলে রোগ ধরে। তখন সকলের চোখে ওই রোগটাই বড় হয়ে ওঠে। দেহটার কথা লোকে ভুলে যায়। জানেন পত্রকার সাব, আজ বিশ বছর আমি আমার ফ্যামিলির বাইরে।

: আপনি ! কেন ?

: আমার স্ত্রী বাঈজীর মেয়ে।

আমার লিবারেল সব প্রশ্ন, সংস্কারহীন এতক্ষণের কথাবার্তার সঙ্গে যেন এই মুহূর্তের বিস্ময়, প্রশ্নের আর যোগ নেই। চিরকেলে হিন্দু যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ডাক্তারের ঠোঁটে এক চিলতে চুন আর সূক্ষ্ম হাসি। হাতে শালপাতার ঠোঙায় জরদা। একটু আগেই দু'খিলি পান উঠেছে মুখে। এক টিপ জরদা আলগোছে মুখের মধ্যে ফেলে পানের রস ওপচানো বন্ধ করার জন্য হনুসমেত দুই চোয়াল ঊর্ধ্বমুখী করে বললেন: বাঈজীর মেয়ে হলেও বাঈজী নন। পেশায় আমার মত ডাক্তার। সরকারী হাসপাতালে অ্যাটাচড। তবু বাঈজীর মেয়ে তো।

বিকেলবেলা ক্রাউন লজের উল্টোদিকে লক্ষ্মী বাঈ-এর দোতলা বাড়ির দোতলায় বসে বাঈজীর মুখেই শুনলাম একই কথা। বয়স বলল তেইশ। দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশের কম নয়। বেঁটে, উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের ওপর গরম আকাশী নীল থ্রি-কোয়ার্টার জ্যাকেট জড়িয়ে স্টিল-গ্রে সিল্কের শাড়ি। ভারী পান পাতার মত মুখ পানে ভর্তি।

বাঁ হাতে ঘড়ি। ডান হাতে সোনার একটা বালা। ঘর জুড়ে জাজিমের ওপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা। দেয়ালের গায়ে তাকিয়া সাজানো। সামনে পিকদানী। দেয়ালে জওহরলাল নেহেরু বুক পকেটে লাল গোলাপ নিয়ে হাসছেন। উল্টো দিকে সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশেই বাবা বিশ্বনাথ। বাইরে বিকেল চারটের রোদ। ঘরে আলো না জ্বললে মধ্যরাত। জাজিমের প্রান্তে হরিণের চামড়ার ওপর এসে বসল লক্ষ্মীবাঈ। সঙ্গে সারেঙীওয়ালা চান্দা খাঁ, হারমোনিয়ামবাদক সরাফৎ খাঁন, পেছনে তবলাবাদক।

প্রথমে মালকোষ, তারপর যোগ—শেষ হল সেই বিখ্যাত অবধি হিন্দীতে লেখা বেনারসী ঠুংরী দিয়ে। এই অবধিতে রামচরিত মানস লিখেছিলেন বলে কাশীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের চোখে তুলসীদাসজী অচ্ছ্যুতে পরিণত হয়েছিলেন।

সমস্ত শরীর অবশ। কোথা দিয়ে দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে টেরও পাই নি। এই কি সেই গান, যে গানে দেহের সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। এই গানের কথাই শুনেছি ডঃ পটেকরের মুখে। এলাহাবাদের এক রইসের অপারেশন হবে। কঠিন কাটাছেঁড়া। অজ্ঞান করতেই হবে, নইলে সার্জেন ছুরি তুলবেন না হাতে। গোঁড়া হিন্দু সেই রইস কাটাছেঁড়া পর্যন্ত মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু অ্যানাসথসিয়া কবভি নেহি। তাহলে উপায়? রোগী নিজেই উপায় বাতলে দিলেন। কাশীর মশহুর কলাকার অধ্যাপক কশলকরকে খবর দাও। গায়ক কশলকরজী এলেন। বললেন, রোগীকে অপারেশন টেবিলে তোল, আমি এই তানপুরা নিয়ে পাশে বসছি।

তিন ঘণ্টা পরে সার্জেন গায়ের অ্যাপ্রন খুলে ফেলে হাত ধুয়ে মুছে যখন বাইরে বেরোলেন, তখন গায়কের হাত দুটি ধরে সকৃতজ্ঞ রোগীর দু'চোখ উপচে বইছে জলের ধারা।

এই গান যে গায় সে কি কখনো ব্রাত্য হতে পারে?

প্রতিটি কথার আগে ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল লক্ষ্মীবাঈ:

পারে বাবুজী। আমি নিজে বি. এইচ. ইউ-র গ্র্যাজুয়েট। মিউজিক নিয়ে এম এ. পড়ছি। আমার এক ছেলে এক মেয়ে। দুজনেই পড়ে সেন্ট মেরিজ স্কুলে। আমার মেয়েকে আর বাঈজী করবো না।

লক্ষ্মীবাঈ জাতে হিন্দু ব্রাহ্মণ। স্বামীর পদবী পাণ্ডে। মিরজাপুরে কার্পেটের ব্যবসা। মাসে একবার করে আসে। নিজের ইনকামও লক্ষ্মীর মাসে পাঁচ হাজার। তবে লক্ষ্মী এখন নামী বাঈজী। অনামীদের আয় মাসে দু'আড়াই হাজারের বেশি নয়। লক্ষ্মীর মনে আছে, ছেলেবেলায় দিদি সরস্বতী বাঈ-এর কাছে যখন নাড়া বেঁধেছিল তখনো এই ডালমণ্ডিতে কম করেও একশ বাঈজী ছিলেন। কমতে কমতে তা আজ এসে ঠেকেছে ত্রিশ পঁয়ত্রিশে।

এখন যারা খদ্দের তারা বাঈজীদের মর্ম বোঝে না। গান নয়, নাচ নয়, সেরেফ দেহের ধান্ধা। অথচ কোন দায়িত্ব নেবে না। সারা জীবনের ভরণ-পোষণ তো দূরের কথা, এক মাসের সাংসারিক খরচা যোগাতেও এদের মন চায় না। এরা সব উঠতি বড়লোক। দোকানদার বা কলকারখানার মালিক। দিদি সরস্বতী বাঈ কবে পেশা ছেড়ে দিয়েছে। লক্ষ্মীও দেবে। শুধু স্বামীর ব্যবসাটা জমার অপেক্ষায় রয়েছে। জমে গেলেই ছেড়ে দেবে। অথচ মাত্র ষাট সত্তর বছর আগেও এই ডালমণ্ডির ঘরে ঘরে ময়না, বিদ্যাধরী, বড়ি মোতি, তোরাভি, ছোটি মোতি, হুস্না, জদ্দন, কাইসর, জওহর, জানকী, কাশী, শাহজাহান, তামি বাঈদের গান শুনতে সারা ভারত ছেঁকে মশহুর সমাজদাররা ছুটে আসতেন। সতেজ জোরালো কণ্ঠের জোয়ারিতে বেনারস ভেসে যেত। রামনগরে গান ধরলে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে শ্রোতারা গলা শুনে বলে দিতে পারত এ কার গান, কার গলা। হিন্দী ফিল্মের ফার্স্ট লেডী নারগিস দত্তের মা জদ্দন বাঈ এই ডালমণ্ডির মেয়ে। ডঃ পটেকরের থিওরি, জদ্দনের গলা ভাল হলেও জোর ছিল না। নামী বাঈজীদের সঙ্গে পাল্লায় না পেরে প্রথমে কলকাতা, পরে বোম্বাই ফিল্মে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আধুনিক ভারতের

বিখ্যাত সব গায়িকা রসুলান বাঈ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, গিরিজা দেবীরও নাড়া বাঁধা এই কাশীতেই।

নীচে রাস্তায় রিকৃশার টুং-টাং, মোটর সাইকেলের বাজখেয়ে গর্জন। সন্ধ্যা নেমেছে। এবার উঠব। দক্ষিণার টাকাটা পকেট থেকে বার করে সারেঙীওয়ালা চান্দা খাঁর সামনে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ আপনি যখন বি. এইচ. ইউ.-তে পড়েন তখন নিশ্চয় ডঃ পটেকরকে চেনেন ?

মুহূর্তে পানের রসে রাঙানো টুকটুকে ঠোঁট দুটো যেন নীল হয়ে গেল। দুটো হাত বুকের কাছে এনে উঠে দাঁড়াল লক্ষ্মী ঃ আপনি মাস্টারজীকে চেনেন ?

ঃ চিনি মানে ? ওদের ওখানেই উঠেছি। ওর কাছে আপনাদের গল্প শুনে ঠিক করেছিলাম এখানে আসব।

বাঈজীর চোখের ইশারায় টাকা ক'টা চান্দা খাঁ তুলে দিল লক্ষ্মীর হাতে। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী বিব্রত মুখে বলল ঃ আমার গুস্তাকি মাফ করুন। টাকা নেওয়া সম্ভব নয়। আপনি মাস্টারজীর বন্ধু। শুধু একটা অনুরোধ। বলুন রাখবেন ?

আমি রীতিমত অপ্রস্তুত, কিছুই বুঝতে পারছি না। আদব-কায়দার কোন ত্রুটি হয় নি তো ? বাঈজীর যা দক্ষিণা তা কি ঠিকমত দেওয়া হয় নি ?

ঃ বলুন রাখবেন ?

ঃ কি রাখতে হবে বলুন ?

ঃ মাস্টারজীকে আমার কথা বলবেন না।

চমকে উঠলাম ! কেন ?

ঃ উনি লক্ষ্মী পাণ্ডেকে চেনেন। ওঁর ছাত্রী। লক্ষ্মী পাণ্ডে যে লক্ষ্মী বাঈ এ কথা উনি জানেন না।

ঃ জানলে কি হয়েছে ?

ঃ আপনি বুঝবেন না বাবুজী। এটা বেনারস, কলকাতা নয়।

লাখ লাখ লোকের মধ্যে ছিপিয়ে আছি, তাই নিজে পড়তে পারছি, আমার ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে। জানতে পারলে মেলামেশা বন্ধ হয়ে যাবে। সমাজের চোখে আমরা যে আজো পতিতা।

কিছুতেই টাকা ক'টা নেওয়াতে পারলাম না। সন্ধ্যায় দশাশ্বমেধ ঘাটে হাজার মানুষের ভিড। কার্তিক মাসের গঙ্গায় পঞ্চপ্রদীপ ভাসাচ্ছে পুণ্যার্থীরা। মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায়। দেখতে দেখতে গোটা গঙ্গা প্রদীপের মালায ক্রিসমাসের পার্ক স্ট্রিট হযে উঠল। মাঝিরা নৌকো নিয়ে হাঁকাহাঁকি করছে। কয়েকজন হিপি একটা বজরা ভাড়া নিয়ে রাতের কাশী নদীর বুক থেকে দেখতে বেরোল। মাইকে ভেসে আসছে ভজন গান। টেপ রেকর্ড করা। অথচ একদিন, ষাট সত্তর বছর আগেও এই ঘাটে বসেই শুনতে পাওয়া যেত বিদ্যাধরী, হুস্না, বড়ি মোতি, কাশীবাঈয়ের ভজন ঠুংরী। এই সময়ের মধ্যে কত ওলট-পালট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা, পাঁচ পাঁচটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, এত স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটি। অথচ যে স্বাধীনতা বিদ্যাধরীদের ছিল, যে সম্মান সেদিনের সেই সমাজ দিয়েছিল, আজ তা কোথায়? লক্ষ্মী পাণ্ডে যে আসলে লক্ষ্মী বাঈ—এই পরিচয়ে ডঃ পটেকর কেন ক্ষুণ্ন হবেন?

উত্তর খুঁজে বার করার আগেই নৌকা দিল ছেড়ে। ঘাট ছেড়ে যত মাঝ গঙ্গায় এগোচ্ছি ততই কাশীর চেহারা বদলে যাচ্ছে। বহুদূরে সেই উত্তরে দাউ দাউ করে নদীর পাডে আগুন জ্বলছে। মাঝিকে প্রশ্ন করতে উত্তর এল—ওই মণিকর্ণিকা ঘাট। হিন্দুস্তান কা সবসে বড়া শ্মশান।

নৌকা ভেসে চলল, শীতে সংকীর্ণ গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে মনে হল এ কাশী কৈশোর বা যৌবনের নয়—পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো জীবিত এই শহর আমাদের বার্ধক্যের বারাণসী।

দুই

বার্ধক্য কাকে বলে ? বয়স ? সেই বয়স যখন চামড়া ঝুলে যায়, চুল পেকে যায়, পেশী শিথিল হয়, চশমা ছাড়া নিকটও মনে হয় বহু দূর—তাকেই তো আমরা বলি বার্ধক্য।

সন্ধ্যা মানতে রাজী নয়। ক্লাসের পর সেদিন রাত্রিবেলা হোলকার হাউসের বসার ঘরে কফি নিয়ে বসে আমরা সবাই গল্প করছিলাম। তামিল ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দুর' কান্নানোরের করেসপনডেনট মহেশ বিজাপুরকার, 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র আমেদাবাদের রিপোর্টার রমেশ মেনন, মালায়ালম 'মনোরমা'র অলেপ্পির ব্যুরো চিফ আলেকজাণ্ডার, মালয়ালী 'দৈনিক দীপিকা'র বার্তা সম্পাদক স্কারিয়া, রায়পুরের হিন্দী দৈনিক 'দেশবন্ধু'র রুরাল রিপোর্টার দিবাকর মুক্তিবোধ আর ওড়িশার ইংরাজী দৈনিক 'নিউজ অব দ্য ওয়ারলডে'র বসন্তকুমার দাস। বাইরের লোকের মধ্যে প্রফেসর শ্রীবাস্তব, দেশপাণ্ডে আর পটেকর।

তিন দিনেই বোরড হয়ে গিয়েছি। নামেই ডেভলপমেন্ট ওয়ারকশপ, আসলে কামারশালা নয়, নিছক পাঠশালা। 'অরগানাইজাররা দিল্লী থেকে কয়েকজন পক্ককেশ প্রবীণকে খাতির করে নিয়ে এসেছেন, আমাদের মত ওয়ারকিং জারনালিস্টদের কাছে ডেভলমেন্ট জারনালিজমের বর্ণপরিচয় সড়গড় করাতে। তিন দিনেই বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে থলি থেকে। বক্তারা নিজেরাই জানেন না কাকে বলে ডেভলপমেণ্ট জারনালিজম। কেউ বলেন, গাঁয়ের গরীব মানুষের দুঃখের কথা লেখ। কেউ বলে, না-না, ঘটনার পেছনের ঘটনাকে

খুঁজে বার কর। একের বক্তব্য অন্যের বক্তব্যকে কচুকাটা করে ফেলছে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই। দূর, এসব ভাল্লাগে না। তাই তৃতীয় দিন বিকেলে ক্লাস কেটে চলে গিয়েছিলাম ডালমণ্ডিতে। সন্ধ্যা পার করে যখন ফিরে এলাম তখন হোলকার হাউসের ডিনার শেষ। সবার হাতে কফির পেয়ালা। কোথায় গিয়েছিলাম, এতক্ষণ একা একা কী করছিলাম, কী কী দেখলাম—নানা প্রশ্ন।

এক কথায় জবাব দেওয়া মুশকিল। তাই কফির কাপটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, বুড়ো বেনারসকে ঘুরে ফিরে দেখছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল সন্ধ্যা। পুনের মহিলা ম্যাগাজিন 'স্ত্রী'-র রিপোর্টার সন্ধ্যা তক্ষশিলা। কেউ তক্ষশিলা বলে না, কায়দা করে উচ্চারণে পদবীটাকে বানিয়ে ফেলেছে ট্যাকস্‌শিলা। ফরসা, ছিপছিপে। কালো কোঁকড়া চুলের ঢালের মাঝে পাতলা গোলাপী ঠোঁট, বড় বড় কালো দুটি চোখ, ঈষৎ ওলটানো নাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সুন্দরী যেন। একটু ম্রিয়মান। চারদিকে বড় বড় কাগজ, নিউজ এজেনসির রাজা-উজির মার্কা সাংবাদিক—তার মধ্যে ও যেন এখনো দিশে খুঁজে পায় নি। প্রথম দিনেই অনেক চেষ্টায় খুঁজে পেয়েছি ওই কালো চুলের ঢালে হঠাৎ হারানো এক চিলতে সিঁথির প্রান্তে হাল্কা সিঁদুরের ছোঁয়া।

পয়লা দিন দুপুরে ট্রেন থেকে নেমে এই হোলকার হাউসে এসে দেখি, তখন পর্যন্ত মাত্র দু'তিনজন এসেছে। একতলায় ডাইনিং এবং সিটিং রুমের দু' ধারে গোটা ছয়েক ঘর। তার মধ্যে একটি সিঙ্গল রুম। ওটিই বেছে নিয়েছিলাম আমি। বিকেলের মধ্যে গোটা ইনডিয়া এসে হাজির। হৈ হৈ, রৈ রৈ ব্যাপার। চারদিকে গোঁফ আর কামানো গাল। মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আদম সুমারির রিপোর্ট বলে পঁয়ষট্টি কোটির অর্ধেক নারী। তাহলে সর্বত্র কেন এত পুরুষের ছড়াছড়ি? দুয়ার থেকে দূরে অদূরে যেখানেই যাই, সব জায়গায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি। কাঁহাতক সহ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত

বেনারসও এত রসকষহীন হবে কে জানত? চুপচাপ নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিভূতিভূষণ পড়ছিলাম, দরজাটা ছিল ভেজানো। হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল। খাটে উঠে বসবার আগেই দেখি চৌকাঠে এক নারীমূর্তি। ঠোঁটের ভাঁজে অস্বস্তি লজ্জা, যেন কত বড় অন্যায় করে ফেলেছে। ঢুকবে কি ঢুকবে না, বুঝে উঠতে পারছে না।

অভয় দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম—ভেতরে আসুন।

তারপর হাত বাড়িয়ে বললাম—দিন, সুটকেসটা আমার হাতে দিন।

—আই এ্যাম সরি। —উচ্চারণে পশ্চিমা বাতাসের টান স্পষ্ট। কেয়ারটেকার বলল, এই ঘরটা খালি আছে। সিঙ্গল রুম, সো আই মে অকুপাই। আমি জানতাম না।

হো হো করে হেসে উঠলাম—তাতে কি। হলই বা অকুপায়েড। নিন না রিকুইজিশন করে। আমি এমনিতেই বাঙালী রেফুজি, আর এক প্রস্থ না হয় রেফুজি হব। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

সন্ধ্যা রইল একতলার ওই ঘরে, আমি উঠে গেলাম দোতলায়। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সারতে এসে দেখি সবাই উপস্থিত। পরিচয়ের আদান-প্রদান হচ্ছে। শুধু সন্ধ্যা আসে নি। রমেশ ও মহেশ দু'জনেই উদ্বিগ্ন। ওদের সঙ্গে একই ট্রেনে দিল্লী থেকে বেনারসে এসেছে সন্ধ্যা। কয়েক ঘণ্টার বাড়তি পরিচয়ে অধিকারের অঙ্গীকার রীতিমত গাঢ়। রমেশ ছুটে গেল সন্ধ্যাকে ডাকতে। এক মিনিটও নয়। দ্বৈত আর্তনাদে সব আলোচনা গেল স্তব্ধ হয়ে—স্নেক, স্নেক।

ছুটে গেলাম সবাই। সন্ধ্যার ঘরের বাইরে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে। কালো জমির ওপর সাদা পাড়ের সিল্কের শাড়ি, ধবধবে ফুল স্লীভ ওপেন ব্রেস্ট কারডিগান, হাতে চিরুনি, ঠক ঠক করে কাঁপছে। সন্ধ্যার কাঁধ সমান উঁচু রমেশ স্যার আশুতোষী গোঁফজোড়া নাচিয়ে যা বলল তার মানে, ভেজানো দরজায় টোকা দিয়ে ও সন্ধ্যাকে ডেকেছে।

সন্ধ্যা ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই এসে দরজা খুলে দিতেই রমেশের সতর্ক চোখ সন্ধ্যার মুখ ছেড়ে সটান নেমে গিয়েছে পদযুগলে। কী ওটা? একটা মোটা কালো ফিতে না? ফিতে তাহলে নড়ছে কেন? নড়ছে কোথায়, সড়সড় করে চলে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যেই সাপ।

চিৎকার চেঁচামেচিতে হোলকার হাউসের কেয়ারটেকার, রাঁধুনী, দারোয়ান, বেয়ারা সবাই ছুটে এল। নানা কাহিনী শুনতে পেলাম। ইউনিভারসিটি হওয়ার আগে এটা ছিল একটা গ্রাম। গ্রামের নাম নাগোয়া। সাপের আস্তানা বলেই ওই নাম। এত বছর পরেও থেকে থেকে বিশ্ববিত্থালয়ের আনাচে-কানাচেয় সর্পদেবতার দর্শন মেলে। কাহিনী সব ফেনিয়ে উঠছে। কে কবে কোথায় কখন ক'টা সাপ দেখেছিল—এইসব গপ্পো।

আর দেরি করা চলে না। রান্নাঘরের পেছনে কাঠের উনুনের জন্য ডাঁই করা ছিল চ্যালা কাঠ। একখানা তুলে 'নিয়ে এলাম। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। ঠিক হচ্ছে না, সাপটা কোথায় কেউ জানে না, যদি ছোবল দেয়। তার চেয়ে ইউনিভারসিটির রেজিস্ট্রারকে ফোন করা যাক। উনি এসে যা হোক করার করুন। ততক্ষণে আমি ভাল করে চারদিক দেখে নিয়েছি। কোথাও নেই। উবু হয়ে বসে দেখি, খাটের তলায় সেই কালো ফিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

কাঠের ডগায় মরা সাপটা ঝুলিয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে আসতে সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ততক্ষণে আলোচনার মোড় ঘুরে গিয়েছে। পয়জনাস না নন-পয়জনাস, পোড়ানো উচিত কি উচিত না ইত্যাদি ইত্যাদি। রান্নাঘরের পেছনে বাগানের এক কোণে আগুন জ্বালিয়ে সর্পদেবতার সদ্গতির ব্যবস্থা করে ফিরে এসে দেখি, সন্ধ্যার সুটকেসটি রমেশ ও মহেশ নিজেদের ঘরের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছে। চূড়ান্ত স্যাকরিফাইস। এ ভাবে অপঘাতে এক অসহায়া নারীকে মরতে দেওয়া চলে না। তাই দুটি ঘরের চার বাসিন্দা একটা

ঘরে চারটি খাট ঠেসাঠেসি করে ঠেকিয়ে মুহূর্তে পাশের ঘরে সন্ধ্যার ঠাঁই করে দিল।

সেদিন ক্লাসে ওই বোরিং লেকচার শুনতে শুনতে যতবার অন্যমনস্ক হয়ে চোখ ফিরিয়েছি, দেখি একজোড়া বিশাল কালো চোখ বহু দৃষ্টির সতর্ক পাহারা এড়িয়ে থেকে থেকে এদিকেই তাকাচ্ছে।

ইংরাজী 'ইউ'-এর বাংলা কি হবে? তুমি না আপনি? যাই হোক, বেশ স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ জানাল সন্ধ্যা—তোমারও তো চুলে পাক ধরেছে বিকাশ। তাই বলে কি তোমায় কেউ বুড়ো বলবে?

প্রতিবাদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন প্রশংসা সম্ভবতঃ মহেশের ভাল লাগে নি। রমেশেরও না। দু'জনই তিরিশ ছুঁইছুঁই। আমার চেয়ে অন্ততঃ দশ বছরের ছোট। রমেশ রীতিমত বেঁটে, মহেশ প্রায় আমার সমান। সন্ধ্যার মত মহেশও মারাঠী। রমেশ দক্ষিণী। তবে জন্ম কর্ম সব আমেদাবাদে। আমাদের লিঙ্গুঁয়া ফ্রাংকা ইংরাজী। বলতে বলতে তিন দিনেই চোয়াল ব্যথা। তবু না হয় কাজের কথা কোন রকমে পি. কে. দেসরকার বা নেসফিলড স্মরণ করে সেরে ফেলা যায়, কিন্তু গলা নামিয়ে ফিসফিস করে প্রাণের কথার আদান-প্রদান কিভাবে সম্ভব ওই বিজাতীয় মাধ্যমে? তবে এ ব্যাপারে রমেশ ও মহেশ দু'জনেই মিলখা সিং।

রমেশ বলে উঠল—বিকাশ লম্বা চওড়া কিন্তু মাথার চুল এরই মধ্যে গ্রে হয়ে গিয়েছে।

—আমার গ্রে হেয়ারই ভাল লাগে। নিজস্ব মতামত পরিষ্কার করে জানাতে গিয়ে সন্ধ্যার ফরসা মুখ টক-টক করে উঠল।

রীতিমত এমব্যারাসিং সিচুয়েশন। বাঁচালেন শ্রীবাস্তবজী। বললেন—বেনারসও ঠিক বিকাশের মত। বাইরে বয়সের ছাপ পড়েছে, তা তো পড়বেই। কালে কালে মন্দ বেলা তো আর হল না। নয় নয় করেও চার হাজার বছর। তবু বলব বয়স যাই হোক, বেনারস ইজ স্টীল ইয়াং।

—কোথায় ইউথ খুঁজে পাচ্ছেন শ্রীবাস্তবজী? তর্কই পারে পুরোনো বিতর্কের মোড় ঘোরাতে। তাই বললাম, যেখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না, সোসাইটিতে মোবিলিটি নেই. সেখানে ইউথ কোথায়? আপনারা প্রফেশনাল সিঙ্গার সিদ্ধেশ্বরী দেবী, গিরিজাদেবীর ফাংশন হলে ব্ল্যাকে টিকিট কেটে দুপুর থেকে লাইন লাগান অথচ বাইজীদের অচ্ছ্যুৎ করে রেখেছেন। এটা নিছক ভণ্ডামি। যৌবন আর যাই হোক ভণ্ডামি বরদাস্ত করে না। বার্ধক্যই ভণ্ডামির ভাঁড়ার।

ঠোঁট টিপে হাসছিলেন শ্রীবাস্তবজী। আমি থামতেই বললেন—এ রকম আরো হরেক কিসিমের ভণ্ডামি এই শহরে আপনি পাবেন। মণিকর্ণিকা ঘাটে যান, হরিশচন্দ্র ঘাটে যান, ডোমদের সঙ্গে কথা বলুন, দেখবেন এই স্যাটেলাইটের যুগেও ডোম বলে ওদের আমরা কোথায় সরিয়ে রেখেছি। তবু বলব চার হাজার বছর বয়সেও বেনারস ইজ ইউনিক ইন ইটস ওন ওয়ে। একেবারে সা-জোয়ান যুবক এই শহর।

মহেশের চোখে রীতিমত রিপোর্টারি জিজ্ঞাসা—চার হাজার বছর বয়স এই শহরের

—আলবত। শ্রীবাস্তবজী টেরিকটের প্যাণ্টের ওপর দিয়ে হাঁটুতে তাল ঠুকলেন।

—এর কোন প্রমাণ আছে? চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল মহেশ।

কফির কাপটা টেবলে নামিয়ে রেখে শ্রীবাস্তবজী বললেন, এর প্রমাণ মিলবে বেদে, মহাভারতে, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত-এ, জবলা উপনিষদে, জাতকের গল্পে, রাজঘাটের প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাবস্তুর সংগ্রহে।

আর্যরা আসার বহু আগেই এই শহরের জন্ম। কাশী শব্দের উৎপত্তি কেউ বলেন সংস্কৃত 'কাশ' শব্দ থেকে। কাশ শব্দের অর্থ যা ঝকঝক করে। কেউ কেউ বলেন, মনুর দ্বাদশ বংশধর রাজা 'কাশ' এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামেই নাম হয়েছে কাশী। অথর্ব বেদে কাশী বলেই এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্য ও রাজধানী

দুয়েরই এক নাম—কাশী। রাজধানীর অপর নাম বারাণসী। পণ্ডিতদের মত বরুণা ও অসি দুই-নদীর মধ্যবর্তী গঙ্গাতীরবর্তী এই শহর বারাণসী নাম অর্জন করেছে নদী দু'টির নামের সন্ধির সূত্রে। জবলা উপনিষদে অসির নাম নসী বলে উল্লিখিত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকেই অসির জলধারা শুকিয়ে যায়। তাই এই শুষ্ক জলধারাকে নসী বলা হয়েছে।

আর্যরা যে এই নগর ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নয়, তার প্রমাণ অথর্ব বেদেরই একটি সূক্ত—"আর্যাবর্ত থেকে তকমা (ম্যালেরিয়া) বিদূরিত হোক। ওই রোগ যাক গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার), মুজাবম (উত্তর কাশ্মীর), কাশী এবং মগধে (বিহার) আমাদের দাস ও উপহার সামগ্রী হিসাবে।"

অর্থাৎ যা শত্রু পরে পরে। কারণ আর্যদের কাছে কাশী তখন শত্রুরাজ্য। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র মহাগোবিন্দ সূত্রে বলা হয়েছে, কাশী আর্য দখলে যায় রাজা রেনুর আমলে। রেনুর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী মহাগোবিন্দ কাশী জয় করেন। রেনু বিশ্বামিত্রের পুত্র।

কাশী বা বারাণসী ছাড়াও বিভিন্ন বৌদ্ধ জাতকে কাশীর ভিন্ন ভিন্ন নাম। কখনো 'সুরন্ধন', কখনো 'সুদর্শন', কখনো 'ব্রহ্মবর্ধন', কখনো 'পুষ্পাবতী' বা 'রম্যনগর'। কখনো আবার 'মালিনী'। ব্যবসায়ীরা আদর করে বলত 'জিতবরী'। বিশাল এই নদীতীরবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্রে বাতাসে তখন অর্থ উড়ত। ধনে মানে জ্ঞানে গরিমায় সেই প্রাচীনকাল থেকে কাশী চির নবীন। মধ্যযুগে মুসলমান শাসনে কাশীর বাইরের খোলস শুধু বদলেছে। মন্দির ভেঙ্গে হয়েছে মসজিদ। কিন্তু কাশী যা ছিল তাই থেকে গিয়েছে। খ্রীশ্চান মিশনারীরাও পারে নি এর সোজা মেরুদণ্ডকে বাঁকা করতে। একটা গল্পো বলি। শ্রীবাস্তবজী ইতিহাসের অলিগলি ছেড়ে সোজা একেবারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে হাজির হলেন।

খ্রীশ্চান পাদরী গলা চড়িয়ে বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের সরাসরি

প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধ্য-সাধনা করছেন। এক সব্‌জিওয়ালা অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ পাদরীর কথা শুনছিলেন। বক্তৃতা থামতে জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে প্রভু যীশু নিজে ভগবান নন? তাঁরও বাবা আছেন? তাই যদি হবে তাহলে বাপকে ছেড়ে ছেলের ভজনা করতে কেন বলছ বাপু? তোমরা কি রাজাকে ছেড়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভজনা কর? এ প্রশ্নের পর পাদরী সাহেব মুহূর্তে উধাও।

কাশীর ধর্মই আলাদা। জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে কিছুতেই তা মানবে না। এমন কি কাশীর কুখ্যাত গুণ্ডারাও যে এ ব্যাপারে অক্ষম, প্রচলিত গল্পেই তার প্রমাণ। গত শতাব্দীর কথা। তখনো বৃটিশ শাসন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মত কাশীতে জাঁকিয়ে কায়েম হয় নি। বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত কাশীর এক এক মহল্লার চৌকিদার সেই সেই মহল্লার গুণ্ডারা, পুলিস-টুলিস তখন নামেই। এক এক মহল্লার আদত পুলিস ওই গুণ্ডারা। বিনিময়ে মহল্লার বাসিন্দারা তাদের ট্যাক্স দিত। ছ'মাসের ট্যাক্স আগাম। ১৮৫৬ সাল। পণ্ডিত গঙ্গাধর শুকুল থাকতেন থাটেরি বাজারে। সেখানে ছ' মাসের গুণ্ডা প্রণামী আগেই দিয়েছেন। ইতিমধ্যে নারায়ণ দীক্ষিত মহল্লায় একটা বাড়ি কিনে উঠে গেলেন। নয়া মহল্লার গুণ্ডারা চেপে ধরল—পণ্ডিতজী, আমাদের দক্ষিণা কোথায়?

পণ্ডিতজীর সাফ জবাব—একবার তো দিয়েছি, আবার কেন?

গুণ্ডারা—সে তো থাটেরি বাজারে। আমাদের এখানে থাকতে হলে আবার আগাম দিতে হবে।

পণ্ডিতজী—না বাপু। ছ' মাস কাটুক। তখন দেখা যাবে।

পণ্ডিতজীর জবাবে অখুশী গুণ্ডারা শাসিয়ে গেল, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে ব্যাঁকা আঙুলের প্রয়োগ হবেই।

দিনকয়েক বাদে বুলানালার কাছে পণ্ডিতজী যেতেই চারদিক

থেকে চার গুণ্ডা পণ্ডিতজীকে ঘিরে ধরলেন—আজ কোথায় যাবে পণ্ডিতজী ? ট্যাকসো দাও, নয় তো মরো।

অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন গঙ্গাধরজী। কিছুতেই কিছু হয় না। এরই মধ্যে কথায় কথায় এক গুণ্ডাকে ঈষৎ অন্যমনস্ক করে ফেলেছেন। হঠাৎ এক হ্যাঁচকায় তাঁর হাতের তেল চুকচুকে মোটা লাঠিটা কেড়ে নিয়ে শুধু দুটি হাতের সাহায্যে গোড়ায় দু' টুকরো, তারপর চার টুকরো করে রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—কী লড়বে, না মানে মানে সরে পড়বে ?

গুণ্ডারা সেদিন সরে পড়েছিল। কাশীর পণ্ডিত মানেই রুগ্ন শীর্ণ শিখাধারী সংস্কৃতবিশারদ, জীবন সম্পর্কে উদাসীন কোন মানুষ নয়। কাশীর পণ্ডিতের একমাত্র তুলনা মেলে প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক, নাট্যকার, জ্ঞানীগুণীদের জীবনে। সোফোক্লীস এসকাইলিস নাটক যখন লিখছেন তখন আখড়ার মাটিতে সপাটে আছাড় মারছেন সে আমলের নামী গ্রীক কুস্তিগীরদের। তাই বলছিলাম, মহাগোবিন্দ থেকে গঙ্গাধরজীর কাশী চার হাজার বছর ধরে জ্যান্ত যৌবনের প্রবাহে আজো জীবন্ত।

শ্রীবাস্তবজী থামলেন। ওড়িয়া সাংবাদিক বসন্তর বোধহয় শীত করছে। পরনে একটা সাদা টেরিকটের প্যাণ্ট আর ফুল হাতা হাওয়াই শার্ট। পায়ে লাল মোজার সঙ্গে ব্রাউন রংয়ের স্ট্র্যাপ বাঁধা চপ্পল। ট্রেনে আসার সময় ওর বেডিংটা খোয়া গিয়েছে। ওই বেডিং-এ ছিল এক বন্ধুর দেওয়া একটা শাল। আর কোন গরম জামা নেই। কটকের কাছে বহুগ্রামে বাড়ি। ভাড়া বাড়ি। বাবা রোগে পঙ্গু। মাও অসুস্থ। ছোট ভাই-এর একটা পা খোঁড়া। বেকার। বড় বোন বিধবা হয়ে দুটি ছেলে নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। গোটা সংসারের ভরসা বলতে বসন্তর চারশ টাকার চাকরিটা। কাশীর এই প্রচণ্ড শীতে আমরা সবাই যখন ডবল কম্বলের ভেতর হাত গুঁজে গরম হবার চেষ্টা করি, একা বসন্ত দোতলার ছাদে আপন মনে

গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। মার্কসিস্ট তত্ত্বে ওর অগাধ আস্থা। নিজের লেখা গান, সুরকার নিজেই। কখনো হিন্দী, কখনো ইংরাজী, কখনো বা মাতৃভাষা ওড়িয়ায়ও গায়। সব গানের অর্থ—এগিয়ে চল। সামনে সূর্য উষ্ণ ও উজ্জ্বল। একদিন সব অসাম্য অন্যায় ঘুচে যাবে। সেদিন জাত-পাত থাকবে না, ধনী-দরিদ্র থাকবে না, সবাই এক, সবাই সমান হবে।

বসন্ত উঠে যাওয়ার আগে শ্রীবাস্তবজীর দিকে তাকিয়ে বলল—এ সব মরা ইতিহাস দিয়ে কি করব? আমরা জ্যান্ত মানুষকে চাই।

কৌতুকের রেখা বর্ষীয়ান শ্রীবাস্তবজীর চকচকে কালো মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল—সে তো আচ্ছা বাত। কিন্তু মুরদার খোঁজ না নিলে জিন্দার হদিশ পাবে কোথায়? এই তো পাশে আয়ুর্বেদজ্ঞ দেশপাণ্ডেজী বসে আছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করো, মানুষকে যে ডাক্তার বাঁচায়, সে ডাক্তারি শেখার শুরুতেই মরা মানুষকে কাটাছেঁড়া করে জ্যান্ত মানুষের নাড়ী-নক্ষত্রের সন্ধান নেয় কিনা?

বসন্ত শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে ওর গলা গমগম করছে—আগে বাঢ় হো, আগে বাঢ় হো, লড়তে ছায় জওয়ান ....

একে একে সবাই উঠছে। বাইরে শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ছে, তার শব্দ। দেশপাণ্ডে, পটেকর, শ্রীবাস্তবজী এবার চলে যাবেন। সন্ধ্যা শ্রীবাস্তবজীকে যেন কি প্রশ্ন করল। শুনতে পেলাম শ্রীবাস্তবজী বলছেন—কাশীকে দেখতে হলে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরতে হবে। মন্দিরে মসজিদে যেতে হবে। অলিগলিতে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে তাকে পাওয়া যাবে। মিলবে মুমুক্ষু ভবনে, শ্মশানে, ডালমণ্ডিতে। নোংরা দেখে ডারটি বলে নাক সিঁটকে ফিরে এলে লোকসান তোমার —কাশীর নয়। ও. কে. গুড নাইট টু ইউ অল।

সবাই চলে গেছেন। আমিও উঠলাম। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শার্টের ওপর হাফহাতা সোয়েটার। তার ওপর আর একখানা ফুলহাতা। তাতেও হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই কে যেন খুব কাছ থেকে ডাকল—শুনিয়ে।

ঘুরে দাঁড়ালাম। দরজার একটা পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা।

—বল।

—আপনি নিশ্চয় এ'কদিন ঘুরবেন। ক্লাস-ট্লাস করবেন না।

—ঠিকই ধরেছ।

—আমি ক্লাস না করলে সকলের চোখে ধরা পড়ে যাব। কিন্তু আমিও এসব দেখতে চাই। আমায় নিয়ে যাবেন?

—বেশ তো, কাল সন্ধ্যাবেলা এখানকার একটা রিফুইজি ক্যাম্পে যাব। ওখানে শুনেছি পূর্ববঙ্গের বেশ কয়েকজন বাঙালী বিধবা আছেন। তারপর ইচ্ছা আছে একবার বাঙালীটোলায়। এক সময় বাংলাদেশ থেকে বাঙালী বিধবারা আশ্রয়ের আশায় কাশী আসতেন। তাঁরা কেমন আছেন, কি ভাবে আছেন, জানার বড় ইচ্ছে। তুমি যাবে?

—যাব। প্লীজ, এ কথা রমেশ বা মহেশকে বলবেন না।

—কেন? ঈষৎ রহস্যের যেন স্বাদ পাচ্ছি।

—এখন বলব না। ওরা আপনাকে স্ট্যাণ্ড করতে পারে না।

—আমি তো ওদের কোন ক্ষতি করি নি।

—কিন্তু ক্লাসে আপনিই সব প্রশ্ন করেন। হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যান। সবাই আপনার কথা বলে।

আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। নিজের অজান্তেই হো হো করে হেসে উঠেছি। ঠিক তক্ষুণি সন্ধ্যার পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল। মহেশের বিরক্ত কৌতূহলী মুখ দরজার ফাঁকে—হোয়াট হ্যাপেনড বিকাশ?

মহেশের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই দেখি বাঁ দিকের দরজার পাল্লাটা নীরবে সন্তর্পণে বন্ধ হয়ে গেল। খুট করে সামান্য একটা আওয়াজ ভেসে এল।

সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বললাম—নাথিং। গুড নাইট।

সিঁড়ির শেষ। সামনে বিশাল ছাদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। ছাদের কিনারা ঘিরে দেবদারু ও অশোক এই জ্যোৎস্নায় প্রহরীর মত সজাগ। ঘরের দরজায় হাত রাখতেই খুলে গেল। ভেতরে আলো জ্বালানো ছিল। একঘর আলোর মধ্যে উষ্ণ নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি, এই তো সেদিন এলাম। এখনো কারো সঙ্গে কারো পরিচয় তেমন দানা বাঁধে নি। অথচ গরল উথলে উঠছে। শুনতে পাচ্ছি বসন্তর গলা। অনাগত ভবিষ্যতে নিশ্চিত সুদিনের কামনায় ওর সুরহীন গান এই শীতরাতকে কি কিছুটা গরম করতে পেরেছে? মহেশ, রমেশ কেন স্ট্যাণ্ড করতে পারে না? সন্ধ্যা বিবাহিতা, লাজুক, নম্র। অথচ ঘর ছেড়ে বাইরে এলে ঘরের অনেক সংস্কার, বিশ্বাস কেন জানি খোলসের মত আপনাআপনি খসে যায়। সন্ধ্যার বর পুনের টি. ভি.-তে চাকরি করে। ওদের এক বছর বিয়ে হয়েছে। ওর বয়স বড় জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ। আমি তো একটা চল্লিশ বছরের বুড়ো ভাম। বেড সুইচটা টিপে ঘর অন্ধকার করে দিলাম। সেদিন নৌকোয় বসে রাতের বারাণসী দেখেছিলাম, আজ পুরোনো কাশী আমার চোখের পাতায় ভর করেছে। যতই চেষ্টা করি, বারবার স্বপ্ন ফিরে আসে। মালিনী, পুষ্পাবতীর মুখ আজো কি চেনা সম্ভব? সব প্রশ্ন ঠেলে একজোড়া বিশাল চোখ আমার চোখে এসে নামল। কি গভীর, কি কালো! ভেতরের সংস্কার বারবার বাধা দিচ্ছে। কিন্তু পারছি কই? কাল সন্ধ্যায় দুর্গাকুণ্ড রোডের সেই রিফুইজি ক্যাম্পে যাওয়ার কথা। ঠিকানাটা দিয়েছেন রেডিওর ডঃ মিশ্র। সন্ধ্যা কি যেতে পারবে? রমেশ ও মহেশ তো তাহলে চটে যাবে। ও নিজেই তো সে কথা বলেছে। যাক গে। কাশীকে চিনতে পারলেই যথেষ্ট। অন্ধকার ঘরে খোলা জানালা পথে খানিকটা জ্যোৎস্নায় মাখা বসন্তের গান এসে পড়েছে। চোখ বুজে আসছে।

তিন

এই কাশীকেই একসময় আদর করে ডাকা হোত নানা নামে—মালিনী, পুষ্পাবতী, সুদর্শন ইত্যাদি। এ সব নাম দু'তিন হাজার বছর আগেই মাটি চাপা পড়ে গিয়েছে। আজ আর বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে না। একদিন সত্যিই এই শহর সুন্দর ছিল, সুদৃশ্য ছিল—এর এক মোহাল্লা থেকে অন্য মোহাল্লার পার্থক্য চিহ্নিত করার জন্য মাঝে মাঝে থাকত ফুলের বাগান। মোহাল্লা বলতে টানা লম্বা গলি। আর সে গলি শুধু পদাতিক ব্যবহারেরই। সেই পথে রথ, অশ্ব কিছুই সেদিন চলত না। তাদের জন্য ছিল বিভিন্ন মোহাল্লার সংযোগকারী সুপ্রশস্ত রাজপথ। পায়ে চলার গলির দু'দিকে সার সার বাড়ি। কোন কোন বাড়ি সেই যুগেও সাত-আটতলা উঁচু হোত। কারণ নিরাপত্তা। গলির দু'টি প্রান্তে থাকত দু'টি ফটক। অন্য মোহাল্লার বা বাইরের কেউ আক্রমণ করতে এলে শুধু ফটক দু'টি বন্ধ করে দিলেই চলত। তাহলে আর আক্রমণকারী প্রবেশ করতে পারত না। মোহাল্লার জনসংখ্যা আপন নিয়মে বেড়ে চলত। বাড়তি বাসিন্দাদের জন্য একতলার ওপর উঠত দোতলা, ছ'তলার ওপর সাততলা।

এ সব পুরোনো কাহিনী শ্রীবাস্তবজী ও পটেকরের মুখে। গঙ্গার পাড় ধরে লম্বা টানা এই শহর। উত্তর ভারতের অধিকাংশ পুরোনো শহর অতীতে যে ভাবে গড়ে উঠত, কাশীও সেই বাঁধাধরা ছকেরই ফসল। কোন বড় সড়ক বা নদীর পারে সমান্তরাল ভাবে শহরের পত্তন হোত। অবিশ্যি চার হাজার বছর পরে সেই পুরোনো ছাঁচ খানিকটা বদলেছে। কাশী এখন পাশেও বেশ বেড়েছে। তবে কাশী

মানেই তো গঙ্গা আর নদীপারের অগুন্তি ঘাট। তাই শহরের যেদিক থেকেই রওনা দেওয়া যাক, সব রাস্তাই ঘুরে ফিরে নিয়ে আসে গোধুলিয়ার মোড়ে। চার রাস্তার জংশন। একটি পথ প্রায় সরলরেখায় কখনো শীর্ণকায়ে কখনোবা খানিক স্থূলত্ব অর্জন করে দক্ষিণে সোজা চলে গিয়েছে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা লংকার দিকে। আর একটি পথ আধ কিলোমিটারের মত। সোজা দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে শেষ। তৃতীয় পথটির দৌড় মণিকর্ণিকা ঘাটের গলির মুখ ছাড়িয়ে চকের দিকে। আর চতুর্থ পথটি গিরজা চৌয়ানিয়া ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে স্টেশনের দিকে। সকাল সন্ধ্যা হাজার হাজার সাইকেল, সাইকেল রিক্শা আর টাঙ্গা চারদিক থেকে সওয়ারী টেনে আনছে গোধুলিয়ার মোড়ে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, আমাদের বর্ধমান টাউনের কারজন গেটের সামনে যেন পৌঁছে গিয়েছি। সাইকেলের চাকা রিক্শার চাকায়, রিক্শার চাকা টাঙ্গার চাকায়, টাঙ্গার ঘোড়ার উদ্যত খুরে স্কুটার রিক্শা লোহার চাদরে প্রায় আঁটা।

সন্ধ্যার নিয়ন আলোয় বি. এইচ. ইউ-র প্রধান ফটকের সামনে প্রশস্ত লংকা রোড উজ্জ্বল। লংকা রোড ছেড়ে উত্তরমুখী সংকটমোচন মারগে রিক্শা ঢুকতেই সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল: আপনার ঠাণ্ডা লাগে না ?

সাদা টেরিকটের ট্রাউজারসের ওপর টকটকে লাল ব্যানলনের কলারতোলা গেঞ্জি আমার পরনে। সন্ধ্যার গায়ে ফুলশ্লীভ সোয়েটারের ওপর সাদা ফুলতোলা ধুসর চাদর। প্রশ্ন আমার পোশাককে কেন্দ্র করে। আসলে এই মরসুমী পোশাক-আশাকের ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে না। অফিসিয়ালি শীত ঘোষণা হলেই গরম জামা পরতেই হবে কেন ? যতটা সম্ভব শীতকে কি গ্রীষ্মকে কি মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেই আসল মজা নেই। তত্ত্বে কথা বাড়ে। তাই আলপিন ফোটানো পাতলা বাতাসে রিক্শার গতিতে উত্তরটা বাড়িয়ে দিলাম: তুমি পাশে আছ বলে লাগছে না।

—ইস্। কুঞ্চিত ভ্রূতে সন্ধ্যা এই সন্ধ্যায় অপরূপা। এ কথা বললে লজ্জা পাবে। স্তাবকতাও মনে করতে পারে। তাই সংক্ষেপে বললাম : সত্যি।

ওর ডান গালের পাশে সরু নীল একটি রক্তবহা নাড়ী চুলের রাশে গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। ফরসা মুখে মুহূর্তে মনে হল ওই সরু নীল ছড়িয়ে গেল। পর মুহূর্তে টোলপড়া গাল একেবারে লাল। হো হো করে হাসতে হাসতে বললাম, কী হোল? লজ্জা পেয়ে গেলে? তুমিও তো রিপোর্টার। জানো, আমি যখন প্রথম রিপোর্টারির চাকরিতে ঢুকি, তখন আমাদের চিফ রিপোর্টার আমায় ডেকে বলেছিলেন, যদি ভাল রিপোর্টার হতে চাও তো চামড়াটা গণ্ডারের করবা। আমি ভাল কি নিরেট কি হয়েছি জানি না, এটুকু জানি এ ক'বছরে চামড়াটা একেবারে গণ্ডারের বানিয়ে ফেলেছি।

আপনি জানেন, আপনাকে নিয়ে আড়ালে কি সব আলোচনা হয়?

জানি না, বুঝতে পারি, তবে জানতে চাই না।

কেন চান না? ওরা বলে আপনি ড্রাংকার্ড, কোর্সের একমাত্র ডিসরাপটিভ এলিমেন্ট। কোর্স ডিরেক্টর বলেছেন, আপনার কাগজের মালিকের কাছে আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠাবেন।

পাঠালে পাঠাবেন। আমার কাগজ জানে আমি কি ধাতুতে তৈরী। ওতে কিছু যায় আসে না।

আমার যায় আসে।

এবার সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। পাশ ফিরে সোজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কেন?

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বলল, জানি না, যান।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাস্তার ধারের একটা সাইনবোর্ডে চোখ পড়ল—দুর্গাকুণ্ড রোড। রাস্তার বাঁ ধারে পেট্রোল

পাম্প। নিশানা মিলে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে বললাম রিক্শাওয়ালাকে : রোককো, রোককো।

রাস্তার ওপরই পুরোনো ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে কাঠের নড়বড়ে গেট। গেটের ওধারে খানিকটা উঠোন। তারপর একটা প্রাচীন তেতলা বাড়ি। এই সেই রেফ্যুজি ক্যাম্প। এসে গেছি। রিক্শাওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। বিশাল বাড়িটার সামনে চার ধাপ সিঁড়ি। এক সময় বোধ হয় কোন রইসের প্রাসাদ ছিল। একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব সিঁড়ির ওপর একটা তারের মাথায় ঝুলছে। ওই আলোতেই চোখে পড়ল বাড়ির নাম : চন্দ্রশেখর-সরলা।

কে চন্দ্রশেখর, কেই বা সরলা ? এই বাড়ি যিনি বানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা-মা হতে পারেন। আবার জীবৎকালে অমরত্বের তাগিদেও স্বনির্মিত কীর্তির গায়ে নিজেদের নাম অঙ্কিত করলেও করতে পারেন। উঠোনের ডান দিকে ঢেউ খেলানো টিনের একটা পাকা ঘর। কারা যেন ভেতরে বসে পড়াশোনা করছে। দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি, হাঁটুর ওপর তোলা ধুতি, গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়ানো শীর্ণ বয়স্ক একটি লোক হ্যারিকেনের সামনে বসে খৈনী ডলছে। তিনটি বাচ্চা দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে। হঠাৎ আমাদের ঢুকতে দেখে খৈনী ডলা ও পড়া দুই-ই থেমে গেল। খৈনী ডলাইকারীর চোখে প্রশ্ন খুব স্পষ্ট : কৌন বা ?

বললাম, আমাদের কিছু আত্মীয়স্বজন শুনেছি এই ক্যাম্পে আছেন। আমরা বেনারসে বেড়াতে এসেছি। তাই একবার খোঁজখবর নিতে এলাম।

খৈনী ডলাইকারী নিস্পৃহ মুখে বলল, ক্যাম্পের বাসিন্দারা সবাই বৃদ্ধা। এখন অনেকেই শুয়ে পড়েছে। কেউ কেউ হয়তো রান্না নিয়ে ব্যস্ত। কাল সকালে আসুন।

পুলিস আর রিপোর্টার এই দু'টি সম্প্রদায়ের চেয়ে মিথ্যায় দড় অন্য

কোন সম্প্রদায়ের মানুষ নয়। অক্লেশে মুখ থেকে বেরিয়ে এল : কাল যে চলে যাব। আর সময় পাবো না। তারপর সবিনয়ে জানতে চাইলাম, আপনি কে ?

হামি এ ক্যাম্পের দারোবান।

তা দারবান সাহেব, আপনি একবার ভেতরে গিয়ে বলুন আমরা কলকাতা থেকে এসেছি দেখা করব বলে।

নাছোড়বান্দাকে তাড়ানোর সেরা উপায় চটপট তার কাজ মিটিয়ে দেওয়া। দারবান সাহেব এই সারবান সত্যটুকুর হদিশ রাখেন দেখলাম। ঘরের এক কোণে একটি টেবিলের দু'দিকে দু'টি চেয়ার, সাইডে একটা লম্বা লো-বেঞ্চি। আমাদের বসতে বলে ওই প্রাসাদের বাসিন্দাদের ডাকতে গেলেন।

আমরা বসলাম মুখোমুখি। বাচ্চাগুলো পড়া থামিয়ে আমাদের দেখছে। পরনে ছেঁড়াখোড়া হাফপ্যান্টের ওপর একটা করে শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি। কতদিন কাচা হয় নি। এই শীতে ওদের কি কষ্ট হয় না ?

কে বাবা কলকাতা থেকে আমাদের খোঁজ নিতে এসেছেন ?

ছেঁড়া ময়লা একটা ধুতিতে মোড়া শ্মশানের যেন পোড়া কাঠ। চামড়া সব ঝুলে পড়েছে। চোখের ওপর নিকেল ফ্রেমের একটা চশমা। হয়তো চল্লিশ বছরের পুরোনো, অভ্যাসবশতঃ চোখে আটা, সম্ভবতঃ কাজে লাগে না। হাতে একটা লাঠি। ওই লাঠি ভর দিয়ে প্রশ্নকর্ত্রী ঢুকলেন ঘরে। পেছনে মিছিল। কৃষ্ণনগরের পোটোদের সাধ্য কি একই ছাঁচে এতগুলি মানুষের মূর্তি বানায় ? অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়—মানুষের ন্যূনতম তিনটি প্রয়োজন যে এদের কোনদিনই মেটে নি, প্রতিটি কঙ্কালই তার নিদর্শন।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, আমাদেরই ঠাকুমা, দিদিমারা আজ কি ভাবে রয়েছেন। সন্ধ্যা হিন্দীতে কথাবার্তা বলছে। এরা দীর্ঘকাল কাশীতে থেকে আজ হিন্দীতে খানিকটা অভ্যস্ত। সবাই

পূর্ববঙ্গের। চল্লিশজন এই ক্যাম্পের বাসিন্দা। বয়স ষাট থেকে আশী। খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ একদিন এদের দেশ ছিল। এক ব্যাপারে এদের মিল আশ্চর্য রকম—সকলেই বালবিধবা। বয়স যার সবচেয়ে কম, তারই ষাট। লাঠি হাতে রঙ্গবালার বয়স আশী পেরিয়ে গিয়েছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই দেখলাম, সন্ধ্যা নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। মহিলা কাগজের রিপোর্টার, তাই প্রশ্নগুলি একটি বিশেষ অ্যাঙ্গেল ছুঁয়ে রয়েছে। কার বাড়ি কোথায় ছিল? কবে প্রথম পূর্ব পাকিস্থান ছেড়ে ভারতবর্ষে এসেছে? সংসারে আর কেউ আছে কিনা? থাকলে তারা টাকা বা চিঠি পাঠায় কিনা? এই ক্যাম্পেই বা এল কি করে? এখানে কি ভাবে চলছে?

উত্তরগুলো সবই একই ছাঁচে ঢালা। সংসারে কেউ নেই। দেশ বিভাগের পর যে যার গাঁয়ের মানুষজনের ভিড়ে সামিল হয়ে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় নানা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এসে ওঠে। শিলচর ক্যাম্প, চাঁদমারি ক্যাম্প, বেলুড় ক্যাম্প। পরে কেউ কেউ আবার দণ্ডকারণ্যের নানা ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। বছর কুড়ি আগে সেনট্রাল গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করলেন, সহায়সম্বলহীন উদ্বাস্তু বৃদ্ধাদের জন্য কাশীতে নতুন ক্যাম্প খুলবেন, যারা আসতে চায় অ্যাপ্লাই করুক। সেই অ্যাপ্লিকেশনের সূত্রেই ফরিদপুরের উজানচর গ্রামের প্রমোদাদেবী আর যশোরের সাধুহাটির শান্তশীলা গাঙ্গুলী আজ এই ক্যাম্পে। মোট চল্লিশজন। থাকার জায়গা দিয়েছে সেনট্রাল গভর্নমেণ্ট। মাথাপিছু মাসে ৩৫ টাকা ডোল দিচ্ছে উত্তর প্রদেশ সরকার। আর বছরে ৩৬টি টাকা এরা পায় ইউ. পি. সরকারের কাছ থেকে। বিশ বছর আগে ওই টাকায় বছরে দু' জোড়া চপ্পল হোত। এখন একজোড়া ধুতিও হয় না।

সন্ধ্যার দারুণ কৌতূহল, এই কটা টাকায় এদের কি করে চলে? কি খায় এরা? রান্না করে তো? সন্ধ্যা বুঝতে পারছে না, আমি

পারছি, এই তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা মানুষগুলির চোখে আমরা নির্ঘস গভরমেন্টের লোক। কুড়ি বছর আগে দেশের বিভিন্ন ডাস্টবিন থেকে যাদের চিমটে দিয়ে ধরে এক জায়গায় এনে সবাই ভুলে গিয়েছিল, এত দিন পরে তাদের কথা হঠাৎ সরকার বাহাদুরের মনে পড়ে গিয়েছে। তাই এত খোঁজখবর। তাই এত তত্ত্বতালাশ। টের পাচ্ছি, সন্ধ্যার প্রশ্নের ভেতর থেকে এই মানুষগুলি যেন নতুন করে বেঁচে থাকার হদিশ পাচ্ছে। গোটা ভিড়টা ছোট ছোট জটলা হয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছে। প্রতিটি রক্তমাংসহীন মুখ এই চালাঘরের হ্যারিকেনের আলোছায়ায় রীতিমত উত্তেজিত। কয়েকজন সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধা শান্তশীলাকে ঘিরে কি যেন বলছেন। কানে এল থেকে থেকে একটা শব্দ বারবার —পত্তর। একখানা পত্তর দিতে হইবে। দ্যাওন চাই। পত্তর না থাকর্লে শ্যাষে এই ছ্যামড়া ও ছেমড়ি বেবাক ভুইল্যা যাইব।

কথাটা বোধহয় শান্তশীলার মনের মত। দু'তিনজন বৃদ্ধাকে নিয়ে তিনি আগে-ভাগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বোধহয় কোন চিঠি লিখবেন। সম্ভবতঃ ওই শান্তশীলাই এঁদের মধ্যে একমাত্র লিখিয়ে পড়িয়ে। কাকে লিখবেন ?

সন্ধ্যা, রঙ্গবালা ও প্রমোদাদেবীর পেছন পেছন একচালা ছেড়ে ক্যাম্পের আসল বাড়ির দিকে যাচ্ছে। পেছন পেছন আমি। তার পেছনে বুড়ীর দল অন্ধকারে মিছিল করে আসছে। ছ'টা বড় বড় সিঁড়ি পেরিয়ে সামনে মস্ত বারান্দা। বারান্দার পর সামনেই দুধারে দুটি বড় ঘর। বিশাল এক একটা ঘরের মাঝখানে সিলিং থেকে ঝুলছে একটা করে ন্যাড়া চল্লিশ পাওয়ারের বাল্ব। অত বড় ঘরে ওইটুকু আলো যেন অন্ধকারকেই উসকে দিচ্ছে।

এক একটা ঘর যেন পঞ্চাশ দশকের শেয়ালদা স্টেশন। একটা দুটো মেটে হাঁড়ি, উনুন, নোংরা ছেঁড়া বিছানা নিয়ে এক একটা ঠিকানা ওই ঘরেই অলিখিত ভাবে মানুষগুলির সীমানা নির্দেশ করছে।

দু'জন বুড়ী ঘরের দুই প্রান্তে ঠাণ্ডা মেঝেয় পড়ে। কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। এখানে ডাক্তার ওষুধের বালাই নেই। সারাজীবন না পেয়ে পেয়ে এরা এতই অভ্যস্ত যে সারার হলে, এদের ধারণা, এমনিতেই সারে। ডাক্তার ডাকার মত বিলাসিতা তো কল্পনার অতীত। সব ক'টি উনুনই নিভোনো। দিন ও রাতের মধ্যিখানে বিকেল বেলা একবার রান্না হয়। রান্না মানে কয়েক টুকরো হাতে গড়া রুটি। ব্যাস। আর একটু নুন। কোন কোনদিন সেদ্ধ ডাল। তাহলে তো একেবারে মোগলাই খানা। কাশীতে এখন গমের কিলো দু'টাকা, চাল দু'টাকা কুড়ি। কত দিন এরা ভাত খায় নি ?

এক বৃদ্ধার বিছানার পাশে ডাঁই করা পুরোনো খবরের কাগজ, কাঁচি ও ময়দার আঠা দেখে সন্ধ্যা জানতে চাইল, এসব কি ? কলকাতার মানুষ হলে সন্ধ্যা এ প্রশ্ন করত না। ঠোঙা বানান বৃদ্ধা। আড়াই টাকা কিলো কাগজ কিনে এক কিলো ঠোঙা বানিয়ে দিলে দুটি টাকা নগদ আয়। গড় বয়স যাদের সত্তর তাদের দুটি টাকা বাড়তি আয়ের জন্য সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কাগজ কিনে রাত জেগে ঠোঙা বানাতে হয়।

কলকাতায় লোয়ার সারকুলার রোডে খ্রীশ্চান মিশনারীদের ওল্ড হোম আমি দেখেছি। অনেক বছর আগে ওই পাড়ায় এক তামাক কোম্পানির বড়া অফিসারের দুটি ছেলেকে আমি পড়াতে যেতাম। বিকেল বেলা। রাস্তার ধারে পাঁচিল ঘেঁষে দোতলা বাড়ি। সারাদিন কলেজে ক্লাস নেওয়ার পর বিকেলে যখন খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করত তখন ওই ওল্ড হোমের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতাম, দোতলার টানা বারান্দায় স্টীলের গোল চেয়ারে বসে এক একজন বৃদ্ধ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গরম চায়ে টোস্ট চুবিয়ে খেতে খেতে রাস্তার গাড়িঘোড়ার অকারণ ছোটাছুটি দেখছেন। জানতাম এঁদের কেউ নেই। তাই মিশন এঁদের এনে এখানে রেখেছে। সব দায়-দায়িত্ব

মিশনের। আমরা এত বড় দেশ, এত আমাদের জনবল, আমরা পারি না আমাদের মা, মাসী, পিসীদের জন্য একটা কিছু করতে?

কাশীতেই আমি দেখেছি, ব্যবস্থা আছে। গোধুলিযা ছাড়িয়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যেতে পড়ে অস্‌সী। অসী নদী থেকে মোহাল্লার নাম অস্‌সী। রাস্তার ওপরেই ধবধবে সাদা দোতলা বাড়ি। পাথরের ফলকে হিন্দীতে লেখা মুমুক্ষু ভবন। নামেই বাড়ির পরিচয়। ভালভাবে জানব বলে একদিন ভেতরে ঢুকে পড়লাম। প্রায় পাঁচ বিঘা জমির ওপর এলাহি ব্যাপার। মন্দির, অফিস, থাকার জায়গা, রসুইখানা, গেস্ট হাউস—কি নেই। অফিস ঘরে আলাপ হল মুণ্ডিত-মস্তক টেরিকটের গেরুয়া জোব্বা পরা মহারাজ পরমানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে। সত্তরের ওপর বয়স। দেশ রাজস্থানে। তবে জন্ম ও কর্ম কলকাতায়। ডানলপ ব্রিজের কাছে বাড়ি। বছর দশেক হল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। তার আগে বাইশ বছর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে কিংসলে করপোরেশন (প্রাইভেট) লিমিটেডের চিফ অ্যাকাউনটেণ্ট ছিলেন। ছেলে, ছেলের বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনীতে ভরা সুখের সংসার। কোন অভাব ছিল না। তবু ভাল লাগল না। একদিন সবাইকে বলে কয়ে চলে এলেন কাশীতে—১৯৭৮ সালের অক্টোবর। এসে উঠলেন এই মুমুক্ষু ভবনে। এখানে যাঁরা আসেন, সকলেই মোক্ষকামী। তাই গৃহী রামেশ্বরলাল ড্রোলিয়া চিফ অ্যাকাউনটেণ্টের ট্রাউজারস হাওয়াই শার্টের সঙ্গে পৈত্রিক নাম বিসর্জন দিয়ে আজ হয়েছেন পরমানন্দ সরস্বতী। বাঁ হাতের মনিবন্ধে দামী হাতঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। পরমানন্দজীর মুখে শুনলাম এই মুমুক্ষু ভবনের ইতিহাস।

ভারতবিখ্যাত সাধক দণ্ডীস্বামীর অনুগামী সন্ন্যাসীদের কাশীবাসের আশ্রয় হিসাবে প্রায় ষাট বছর আগে ১৯২৩ সালে স্বামী ঘনশ্যামানন্দ তীর্থ এই ভবনটি স্থাপন করেন। যো আদমী মোকষ্‌ চাহতা আউর মরণা চাহতা, উও ইধার আতা। দেড়শো থেকে দুশো জনের থাকার

ব্যবস্থা আছে। স্ত্রী পুরুষে মোক্ষ কামনায় যেমন ভেদাভেদ নেই, তেমনি এখানে আশ্রয় লাভেও নেই লিঙ্গ-বিবেচনা। জায়গা থাকলে ঠাঁই মিলবে। ঘর ভাড়া বলে কিছু নেই। তবে জল ও বিদ্যুতের জন্য রোজ একটি টাকা দিতে হবে। ইচ্ছে হলে মিল চার্জ দিয়ে ভবনের খাবার খেতে পারো। আড়াই টাকায় পেট ভরে—রোটি, চাউল, ডাল, দুরকমের সবজি, রায়তা ও চাটনী। আবার অনেক মোক্ষকামী পুণ্যার্জনের জন্য ভিক্ষে করে খান।

পরমানন্দজী এক গুজরাটী সাধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। পঁচাশি বছর বয়স। স্বামী আনন্দ সরস্বতী। আজ চব্বিশ বছর ধরে মুমুক্ষু ভবনে পড়ে আছেন—এখনো মোক্ষ লাভ হয় নি। স্বামীজীর শিষ্যরা সারা ভারতে ছড়িয়ে আছেন। তাঁরা গুরুদেবের জন্য প্রণামী দিয়ে যান। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। গুরুদেব প্রায় সবটাই কাশীর অনাথ আতুরদের সেবায় দেন বিলিয়ে।

এই মুমুক্ষু ভবনের গেস্ট হাউসে শুনলাম বিমলবাবু উঠেছেন। সাহেব-বিবি-গোলামের বিমল মিত্র। তবে কি উনিও মোক্ষকামী? খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বন্ধ দরজার কড়া নাড়লাম। একটু বাদে দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে বিমলবাবু। লুঙ্গির মত জড়ানো ধুতির ওপর পাঞ্জাবি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বেশির ভাগ পাকা চুল ঝামড়ে পড়েছে কপালে। পরিচয় দিতে চিনতে পারলেন। ভেতরে আসতে বললেন। একটা চৌকির ওপর বিছানা পাতা। বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মাথার ধারে টেবিল ও চেয়ার। কথায় কথায় বললেন, এক হিন্দী প্রকাশকের অনুরোধে কাশীতে এসেছেন দিন কয়েকের জন্য। মুমুক্ষু ভবনের শান্ত পরিবেশে মজে গিয়েছেন। বললেন, এবার থেকে প্রতিবার পুজোর আগেই চলে আসবেন।

কি হল যাবেন না? চলুন এবার যাই।

এতক্ষণে তাহলে সন্ধ্যার সব প্রশ্নের জবাব মিলেছে। দোতলা

ক্যাম্প বাড়িটার সব ক'টা ঘর দেখে নীচে নেমে এসেছি। আমাদের ভিড় করে ঘিরে দাঁড়িয়ে রঙ্গবালা, প্রমোদাদেবীরা। বললাম, চল, রাত হয়েছে। এবার ফেরা যাক।

রাস্তায় এসে রিক্‌শা দাঁড় করালাম। সন্ধ্যা উঠল। আমি উঠতে যাব। পেছনে গেটের সামনে সার সার ছায়ামূর্তি। আমার গেঞ্জিটা যেন কে পেছন থেকে টেনে ধরছে। ঘুরে দাঁড়ালাম। শান্তশীলা গাঙ্গুলী। ডান হাতে একটা ঠোঙা। থুরথুরে বুড়ী কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, এইটা লইয়া যান।

কি নেব? কি দিচ্ছেন? কেন দিচ্ছেন? রিক্‌শা ছেড়ে দিল। কার্তিকের শীত জাঁকিয়ে নেমেছে। স্রোতের মত ছু'দিক থেকে রিক্‌শা, টাঙ্গা, স্কুটার রিক্‌শা বয়ে চলেছে। আস্তে বললাম: এই রাতে মণিকর্ণিকা ঘাট নিশ্চয় গমগম করছে। যাবে?

অন্যমনস্কের মত রাস্তার ধারের দোকানপাটের আলোয় উজ্জ্বল সাইনবোর্ডগুলোয় চোখ এঁটে সন্ধ্যা বলল: তবে এতক্ষণ কোন্ ঘাটে ছিলাম? ওরা কি কেউ জ্যান্ত? জ্যান্ত মানুষের জন্য এত বড় শ্মশান এর আগে আমি আর কখনো দেখি নি। ওরা কি দিল আপনাকে?

ঠোঙার মুখটা খুলে রাস্তার আলোয় দেখলাম ছুটি প্যাঁড়া। বার করে আনলাম।

সন্ধ্যা অবাক, বিস্মিত। বলল, কেন এসব দিল?

আমি ওর হাতে একটা প্যাঁড়া তুলে দিলাম।

আবার জানতে চাইল, বললেন না কেন দিল?

বললাম, বাড়িতে অতিথি এলে তাকে জল মিষ্টি দিতে হয়। এদের একটা প্লেটও নেই। তাই ঠোঙায় দিয়েছে। আর এই চিঠিটা।

সন্ধ্যা আমার হাতের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, কিসের চিঠি?

ঠোঙার ভেতর থেকে একটা ফুলস্কেপ ভাঁজ করা কাগজ ততক্ষণে

বার করে এনেছি। অন্ধকারেও বুঝতে পারছি, কাঁপা কাঁপা বড় বড় হরফে লেখা কোন আরজি। বললাম, এরা এখনো বাঁচতে চায়। মুক্তির কোন ইচ্ছা নেই। তাই যে কটা দিন বাঁচবে সে ক'টা দিন যেন সরকার বাহাদুর বাঁচার মত দক্ষিণার ব্যবস্থা করেন। গত বিশ বছরে কেউ তো এদের কোনদিন খোঁজ নেয় নি। এতদিন পরে হঠাৎ আমাদের দু'জনকে দেখে ওদের মনে হয়েছে আমরা সরকার বাহাদুরের লোক। ওরা তো জানে না সরকার কি বা কারা? তাই আরজিটা ধরিয়ে দিয়েছে।

ঠাণ্ডা বাতাসে হাতের পুরু লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। গেঞ্জিতে আর পোষাচ্ছে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৌরুষকে ঠাট্টা করে দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বসছে। কি যেন একটা আমার পিঠের ওপর দিয়ে গায়ে এসে পড়ল। সন্ধ্যা ওর চাদরটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে গেলাম। হেসে বলল, আমার গায়ে ফুলস্লীভ সোয়েটার আর আপনি পাশে বসে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছেন। না, তা হয় না। কোন ওজর-আপত্তি শুনব না। গায়ে জড়িয়ে নিন।

বাধা দিয়ে লাভ হবে না। চাদরটা গায়ে জড়াতে জড়াতে শুনতে পেলাম ও বলছে, ওই ঠাণ্ডা মেঝেয় যে বুড়ী দু'টি শুয়ে আছে, ওদের কি কেউ একটা কম্বলও দিতে পারে না? এত বড় শহর। সারা ভারত থেকে কত লোক এসে কত দান করছে। এদের কেন কেউ কিছু দেয় না?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই! রাস্তার দু'ধারে ব্যাপারীরা ফুলকপি আর পেয়ারা সাজিয়ে বসে আছে। এত রাতেও কেনা-কাটা চলছে। বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির সামনের রাস্তাটা কলকাতার ভি. আই. পি. রোডের মত চওড়া। গোটা কাশীতে আর কোথাও এত চওড়া রাস্তা নেই। সামনে ইউনিভারসিটির প্রধান ফটক।

রিক্শাওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা বলে লংকা গেট। আজ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, ষাট বছর আগে সেখানে ছিল গ্রাম। সেই গ্রামের নাম লংকা। গেটের সামনে বি. এইচ. ইউ-র প্রতিষ্ঠাতা মদন মোহন মালব্যর বিশাল ব্রোন্জ মূর্তি। মালব্যজীর পা ছুঁয়ে রিক্শা এসে থামল লংকা গেটের মুখে। রিক্শা থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিয়ে তার ভেতরে প্যাঁড়াটা রেখে দিয়ে সন্ধ্যা বলল, এটা আমি রেখে দেব। বেনারসের স্যুভেনির।

চার

স্বল্প আসবেষ্ট দেবরাজ বাসবে পরিণত হন শ্রীবাস্তবজী। পেশায় সমাজবিদ্যার অধ্যাপক। সাইজে একেবারে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। তফাৎ হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সদাসর্বদা ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন, শ্রীবাস্তবজীকে দেখলে মনে হয় থ্রি পীস সুট পরেই জন্মেছেন। দ্বিতীয় পার্থক্য, বিরল কেশের অধিকারী এই অধ্যাপক বাক-বিভূতিতে যে কোন কথক ঠাকুরকে অনায়াসে হার মানাতে সক্ষম।

আর্যরা যখন অনার্য-নগরী বারাণসী দখল করে, তখন ওই নগরবাসীদের একাংশ দাসত্ব মানতে অস্বীকার করে পাহাড়ে-পর্বতে পালিয়ে গিয়েছিল। বারাণসী জেলার গায়েই মিরজাপুর জেলা। ওই মিরজাপুরেই বিন্ধ্য পর্বত। পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির বিন্ধ্যাচলে। ওই বিন্ধ্যাচলের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে লাখ লাখ আদিবাসী, যাদের পূর্বপুরুষ একদা আর্য-বশ্যতা অগ্রাহ্য করে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। এ সব কথা শুনেছি শ্রীবাস্তবজীর মুখে।

অসামান্য কথক ঠাকুর সুটেড-বুটেড শ্রীবাস্তবজী। অস্‌সী ঘাট থেকে নৌকো ছাড়তেই মুখে মুখে কাশীর ধর্মীয় উত্থান-পতনের ইতিহাস বর্ণনা করে চলেছেন। আজ আর বিকেলের ক্লাসে যাই নি। লাঞ্চের পর হোলকার হাউস থেকে সবাই যখন এক এক করে ফাইলপত্র, নোট-ফোট বগলদাবা করে ক্লাস-রুমে যাচ্ছে তখন নিজের ঘরে চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিলাম। ওড়িশার নিউজ অব দ্য ওয়ার্লডের বসন্তকুমার দাস উঁকি মেরে বলল—দাদা, ক্লাসে যাবেন না?

বললাম—এসব ক্লাস-ক্লাস আর ভাল লাগছে না। যাব না।

ওকে বলি নি, শ্রীবাস্তবজী আর ডঃ পটেকর একটু বাদেই আসবেন। ওদের সঙ্গে নৌকো করে আজ ঘাট দেখে বেড়াব। সন্ধ্যার পর যাব মণিকর্ণিকায়। গঙ্গার পাড়ে সেই মহাশ্মশানে দেহধারী শ্মশানেশ্বর স্বয়ং কৈলাসের সঙ্গে হবে মোলাকাৎ। স্থানীয় ডোমদের সর্দার কৈলাস চৌধুরী নাকি কালু ডোমের বংশধর। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের কালু ডোম তো ইতিহাস-বিশ্রুত। আর ইতিহাস-মানেই তো পুরাণ। পৌরাণিক বংশতাবংশের সঙ্গে জান-পহেচান নির্ঘাৎ যে কোন ক্লাসের লেকচারের চেয়ে সাংবাদিকের কাছে অনেক বড় সংবাদ।

সন্ধ্যা জানত। লাঞ্চের সময় প্লেটটা হাতে নিয়ে এক সময় আমার কাছে এসে বলল, ক'টার সময়?

—তিনটে।

—তবে যে ক্লাস কামাই হবে।

—উপায় কী?

—যদি কোরস ডিরেকটর আমার কাগজের এডিটরের কাছে নালিশ করে?

এ প্রশ্নের পর আমি আর হাসি সামলাতে পারি নি। হাসি থামবার আগেই দেখি, সন্ধ্যা ডাইনিং রুমের অন্য ধারে ছিটকে গিয়েছে। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মহেশ বিজাপুরকার আর রমেশ মেনন। সন্ধ্যার মুখ চোখ লাল। খাচ্ছে না, পাখির ঠোঁটের মত আঙুল দিয়ে খাবার খুঁটছে। আর দুই সাংবাদিক তোড়ে প্রশ্নবাণে ওকে বিদ্ধ করে চলেছে। থেকে থেকে মহেশ ও রমেশের দু' জোড়া চোখ রাইফেলের নল হয়ে আমাকে তাক করছে। বেচারা সন্ধ্যা। সাংবাদিক হয়েও স্বাধীনতা নেই। মহিলা যে। ওর নারীত্বের রক্ষক এই দুই দারোয়ানের কড়া পাহারা এড়িয়ে এক পাও নড়বার জো নেই।

ট্র্যাডিশনাল ভারতীয় তুই হিন্দু মহেশ ও রমেশের চোখে আমি মূর্তিমান উচ্ছৃঙ্খল, বিদ্রোহী এক বাঙালী।

খানিক বাদেই এলেন শ্রীবাস্তব ও ডঃ পটেকর। শ্রীবাস্তবজী আসেন না, রীতিমত আবির্ভূত হন। ভেজানো দরজায় পদাঘাত। পাল্লা দুটি সুন্দরী রমণীর দোপাট্টার মত পদাঘাতে অপসৃত হতে না হতেই উদাত্ত প্রশ্ন—গাঙ্গুলী, আছে নাকি কিছু ঘরে?

শুয়ে শুয়েই জবাব দিলাম—দেয়াল আলমারিতে খাঁটি একটি পাঁইট কাশীর সুরাসার, টেবলে জলের জগ ও গ্লাস মজুত। দয়া করে ইচ্ছা করুন।

ইচ্ছাবসানে হোলকার হাউস থেকে হেঁটে এলাম লংকা গেট। হোলকার হাউসের উল্টো দিকেই বি এইচ. ইউ.-র ভাইস চ্যান্সেলরের সরকারী নিবাস। লোহার দরজার ফাঁক থেকেই চোখে পড়ে সবুজ লন ঘিরে ডালিয়া ও গোলাপের অপরূপ সজ্জা। তারপর মালবীয় ভবন। এই বাড়িতেই বি. এইচ. ইউ.-র প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্য তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছেন। দোতলা বিশাল বাড়ি। রঙীন ফুল ও সবুজ ঘাসের ঠিক মাঝখানে স্বপ্নপুরীর মত। এ বাড়িতে ধর্মীয় তত্ত্বালোচনা নিত্য লেগে থাকে। শীতের শেষ দুপুরে চওড়া পীচ রাস্তার দু'ধারে হলুদ পাতার ঝরন চলছে এলোমেলো হাওয়ায়। রাস্তার ডান দিকে ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স-এর বিশাল বাড়ির সামনে প্রাইভেট কার, মোবাইল মেডিকেল ভ্যান ও রিক্শার ভিড়। ঠিক উল্টো দিকে, রাস্তার বাঁ ধারে হাসপাতালের বিল্ডিং সারি।

কলকাতায় সাংবাদিকতা জীবনের শুরুতে বেশ কয়েকবছর আমাকে ইউনিভার্সিটি, বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশন কভার করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও আই. আই. টি. খড়গপুর, সমেত পশ্চিমবঙ্গের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও নামী দামী কলেজ এবং স্কুল পেশার প্রয়োজনে আমাকে ঘুরতে হয়েছে। দেখে-শুনে

এবং এবার কাশীবাস করে আমার সেই পুরনো ধারণাটাই বদ্ধমূল হোল—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাঁরা এত বড় দেশ শাসন করেছেন, তাঁরা সমাজ গড়ার প্রথম ধাপেই শিক্ষার সূত্রে দু' ধরনের নাগরিক সৃষ্টি করছেন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও আই. আই. টি.-গুলির দিল্লীর দৌলতে অঢেল টাকা। এই হতদরিদ্র দেশে ওই প্রতিষ্ঠানগুলি যেন পাঁচ তারা হোটেল এক একটা। আর ঠিক তার পাশেই রাজ্য সরকারের স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটিগুলি যেন কলাবাগানের বস্তি।

—কি হল গাঙ্গুলী, গুম মেরে কেন?

সামনেই গঙ্গা। অস্‌সী ঘাট। নামেই ঘাট। আসলে এখানে গঙ্গার পাড় ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে জলের কিনারে। লংকার সবচেয়ে কাছে এই ঘাট। একদা অস্‌সী নদী এখানে গঙ্গায় মিশেছিল। এখন সেই পুরাণখ্যাত নদী সিমেন্ট বাঁধানো নালা, আড়ে-বহরে সি. এম. ডি. এ.-র যে কোন পাতাল-ড্রেন এর চেয়ে একটু বড়। কলকাতার পাতাল রেলের খাদ তো এর তুলনায় সত্যিকারের নদী। লংকা গেট থেকে রিক্‌শায় নিল দশ মিনিট ও একটি টাকা। নদীর গায়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে নৌকো। নামতে নামতে প্রশ্ন করলেন শ্রীবাস্তবজী। জবাব দেওয়ার আগেই দেখি ছুটে আসছে মাঝিরা। কেউ বলে দশ টাকায় সব ঘাট দেখাবে। কেউ বলে আট টাকায়। দরদামে যে শ্রীবাস্তবজী রীতিমত দস্তুর তা প্রমাণ করে ছাড়লেন। ছ' টাকার এক পয়সাও বেশি নয়। নৌকো ছেড়ে দিল।

শীতের শীর্ণ গঙ্গা। কলকাতার গঙ্গার ঠিক অর্ধেক। তবে অপর পাড়ে ধু-ধু করছে বালির চড়া। সে চড়া অন্ততঃ মাইলখানেক বা দেড়েক। তারপর অরণ্যের কালো আভাস। মাঝি দাঁড় টানতে টানতে গর্বভরে বলল, বর্ষাকালে দেখবেন এই গঙ্গার কী চেহারা!

কী তেজ! তখন দেখলে চিনতেই পারবেন না গঙ্গা মাঈকে। ভয়ে বুক কাঁপবে। এপার-ওপার নৌকোয় পেরোতে ডর লাগে।

জল বড় ময়লা। খানিক বাদে বাদেই চলমান দ্বীপের মত কি সব ভেসে যাচ্ছে, ওপরে বসে শকুনি ও কাক। নৌকো থেকে দেখতে পাচ্ছি, গোটা বেনারসের সর্বাঙ্গের আবর্জনা ধুয়ে বড় বড় নহর ফুঁড়ে তোড়ে ময়লা জল এসে মিশছে পৃথিবীর পবিত্রতম নদীর লহরীতে। ওই সব নহরের গায়ে গায়ে বড় বড় ঘাট। পাথরে বাঁধানো ঘাটের ওপরে বিশাল বিশাল ছাতার নীচে পুরোহিত সন্ন্যাসীর দল। সমানে স্নান চলছে। লাউড স্পিকারে কানফাটানো ভজন। ছোট ছোট বজরায় হিপি-হিপিনী ও বিদেশী টুরিস্ট দল। কাঁধে ক্যামেরা, চোখে রোদ-চশমা, পরনে খাকি হাফপ্যান্ট। মেমদের অমলধবল পদযুগলে পবিত্র গঙ্গা মৃত্তিকা চন্দনের মত লেগে। মাঝে মাঝে টেরিকটের ট্রাউজারসের ওপর কলার তোলা কালারড সোয়েটারে রীতিমত মড বেনারসী বিশ-বাইশের এক একটা দঙ্গল নৌকো নিয়ে নদী পারাপারে ব্যস্ত। এরা কেউ মাঝি নয়। মাঝিরা এদের ভয় পায়। এক এক মহল্লার সব নামজাদা মস্তান। নদীর ওপারে বালিয়াড়িতে সন্ধ্যার পর এদের মাইফেল বসে। একদল বিকেলের শুরুতেই ব্যবস্থা সারতে যায়। পরের ট্রিপে রামকৃষ্ণদেব কথিত পরম-বর্জনীয় দুই মহা 'ম"-এর তৈজসে নৌকো বোঝাই হয়ে চলে সন্ধ্যারাতের উৎসবে। পুলিস জানে। মাঝিরা অসহায়। বাধা দেওয়ার সাহস ও ক্ষমতা কারো নেই। দিলেই বেনারসী যৌবন হু-হুঙ্কার করে উঠবে। যদি উৎসব জমে, তবে মৌতাত শেষে ফেরার পথে মাঝিরা গোটা বিকেল, সন্ধ্যা ও রাতের জন্য নৌকো ভাড়া বাবদ কখনো-সখনো এক টাকা-দু' টাকা পায়। তাতেই খুশ হতে হবে। নইলে এইসব হরিজন ও মুসলমান মাঝিদের ওপর উচ্চবর্ণীয় হিন্দু যৌবনের নন্দী ভৃঙ্গীদের তাণ্ডব অনিবার্য।

এই নদীতে জোয়ার নেই, ভাঁটা নেই। স্রোত সর্বদা একমুখী।

সব জল ছুটে চলেছে সমুদ্র-সন্ধানে। ছোট ছোট জলের আবর্ত। গাঙ-শালিখ ও মাছরাঙারা 'বিকেলের রোদে ডানা শুকোতে না শুকোতেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোঁট, নখের ডগা গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে তুলছে। থেকে থেকে ওপার থেকে দমকা বাতাস আমাদের গায়ে ঝুরো বালির পুষ্পবৃষ্টি করে উধাও। গলুই-এ বসে অন্যমনস্ক পটেকর গুনগুন করে গান গাইছেন। তামাটে বসন্তের ক্ষতচিহ্নে তোবড়ানো মুখ আশা-নিরাশায় ক্ষতবিক্ষত। কাশী অন্ন দিলেও, প্রাপ্য প্রার্থিত প্রতিষ্ঠা দেয় নি মানুষটিকে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, সাংবাদিক গাঙ্গুলী যদি একবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাগজে এই অপরিচিত প্রতিভার কথা দু' এক কলম লেখে, তাহলে, ভারতের সঙ্গীত-রাজধানী কলকাতা নিশ্চয় ওকে আমন্ত্রণ জানাবে। আর সেই সুযোগ এক নয়া এল-ডোরাডোর দরজা খুলে দেবে এই মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত সাধকের কাছে।

এই নৌকোর মাঝি, ওই সঙ্গীত-সাধক, বজরার ওই সব বিদেশী টুরিস্ট, বৈঠা মুঠিয়ে ধরা বারাণসীর ওই যৌবন—এদের কাছে কাশী কি কোন অর্থ তুলে ধরে? কেন কাশী যুগ যুগ ধরে স্বদেশী ও বিদেশীদের কাছে এক অপরূপ নগরী? যাদের দরজায় মৃত্যু হেঁকে কড়া নেড়ে গিয়েছে, দুর্গাকুণ্ড রোডের উদ্বাস্তু শিবিরের ওই চল্লিশ বৃদ্ধা কেন হিন্দু হয়েও মোক্ষ চান না? আবার মুমুক্ষু ভবনে সেরেফ মোক্ষ লাভের আশায় কেন চব্বিশ বছর ধরে দিন গোনেন সাধু মহারাজ? মোক্ষ কী? কাশীতে মরলে কেন মোক্ষলাভ হয়?

—কি গাঙ্গুলী, তখন থেকে চুপ করে আছ যে বড়? কি হল? ভবিষ্যৎ গড়বড়?—বলতে বলতে পাঁইটটার তলানীটুকু আলগোছা গলায় ঢেলে দিয়ে কাক-শকুনি বসা একটি চলমান দ্বীপ লক্ষ্য করে টিপ কষলেন শ্রীবাস্তবজী।

অদূরের ঘাট থেকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, চারদিকে যেখানে এত অনাচার, ওই নহরভরা নোংরা জলের মত যে শহরটা ধর্মীয় বিষ্ঠায় এত মাখামাখি, সেই শহরের ওপর এত লোকের এত টান কেন?

—ওহ্, এই ব্যাপার ? তার জন্য এত গম্ভীর হওয়ার তো কোন প্রয়োজন নেই গাঙ্গুলী। তুমি কাশীর ইতিহাসটা একবার উল্টে-পাল্টে দেখে নাও। তাহলেই উত্তর পাবে।

নৌকো একটু একটু করে এগোচ্ছে। পৈঠার থাপ্পড়ে জল চূর্ণ হয়ে ছিটকে এসে পড়ছে গায়ে। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে রোদের আঁচ কমিয়ে দিচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি শ্রীবাস্তবজীর কথকতা—জানো গাঙ্গুলী, এই একটি শহরে তিন তিনটি প্রধান ধর্মের জন্ম। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ।

আজ থেকে চার হাজার বছর আগে অনার্য আদিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে আর্যরা যখন এই শহর দখল করে তখন থেকে দুটি স্বতন্ত্র ধর্মচর্চার সূত্রপাত হয় কাশীতে। সপ্তসিন্ধুর হিন্দু আর্যরা কাশীতে বেদচর্চা শুরু করে। আর পরাজিত, অনুগত আদিবাসীরা তাদের দাসত্ব মেনে নিয়েও স্বধর্মে অটল রয়ে যায়। গোড়ায় স্ব-স্ব ধর্ম পালনে বিশেষ কোন বিরোধ দেখা না দিলেও পরে দেখা যায়। শক্তিশালী বিজয়ীর ধর্ম সহজ কারণেই বিজেতাকে অস্থির করে তোলে। বিজয়ীর ধর্মেই তার শক্তি নিহিত—এই বোধ থেকে পরাজিত আদিবাসীরা যত ঝুঁকতে থাকে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে, ঠিক তত পরিমাণেই আর্যশক্তির মূল স্রোত থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন কাশীবাসী স্বল্পসংখ্যক আর্য আদিবাসী ধর্মের অলৌকিকত্ব, ম্যাজিক এবং নিছক দৈহিক চাহিদার তাগিদে আদিবাসী ধর্মের দিকে হয় আকৃষ্ট। কে কার খাদ বলা অসম্ভব, তবে দুয়ের মিশ্রণে জন্ম নেয় নতুন এক ধর্মীয় চেতনা। যে চেতনা ধর্ম, অর্থ ও কামকেই মানুষের চরম চাহিদা বলে মেনে নেয়। কিন্তু চরম প্রাপ্তিতেও অতৃপ্ত মানুষ তবু অস্থির, তবু অশান্ত। শত প্রাপ্তিতেও তৃষ্ণা মেটে না। শেষে প্রাপ্তির তৃষ্ণা মরে গিয়ে জন্ম নেয় এক নতুন অতৃপ্তি—অতঃ কিম ? এই আদিঅন্তহীন প্রশ্নের জবাবে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা বললেন, ভোগে নয়, ত্যাগেই মুক্তি। আর পরম মুক্তি তখনই সম্ভব যখন পুনর্জন্মের অসার কষ্ট থেকে রেহাই মিলবে। আর

সেই মুক্তিই হল মোক্ষ। ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা। নদীর যেমন পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে সাগর মোহানায়, তেমনি পরমাত্মার মিলনেই আত্মার সদগতি।

এই সদগতির সন্ধানে আর্যধর্ম যখন ক্রমাগত যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দানের ওপর জোর দিয়ে চলেছে, তখন ধর্মের মূলমন্ত্র ছেড়ে সাধারণ মানুষ শর্টকাটের আশায় ধর্মের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞ ও হবন-এর দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। যোগ, বিশেষ করে হটযোগের ক্রিয়াকলাপে গ্রাস করে ফেলেছে ধর্মের মূল বক্তব্য। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের কথা, সমস্ত কাশী তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ধর্মের নামে আদিবাসী প্রভাবিত বৈদিক কর্মকাণ্ডের এক বিচিত্র অনাচারে।

এরই সম সময়ে, খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ আটশো বছরের মাথায় মাথায় পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন বারাণসীতে। কাশীরাজ অশ্বসেনের ছেলে পার্শ্বনাথ রাজবাড়ি ও রাজ্যের সর্বত্র ধর্মের নামে নারকীয় পশুহত্যা, সপ্তাহ-মাস-বর্ষব্যাপী বিপুল যাগযজ্ঞ এবং বিচিত্র সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে বললেন, মানুষ যদি সত্যিই মোক্ষলোভী হয় তাহলে তাকে তিনটি মহাব্রত পালন করতে হবে। কি সেই তিন মহাব্রত?—অহিংসা, অস্তেয় (অচৌর্য) এবং অপরিগ্রহ। মজার ব্যাপার, শ্রেণী বিভক্ত আর্য-অনার্য কাশী সমাজের বৈশ্যকুল গ্রহণ করলেন এই নবধর্ম, যার নাম জৈন ধর্ম। অপরিগ্রহ মানে হল সঞ্চয় না করা, কিন্তু সেই পরমব্রত যাঁরা গ্রহণ করলেন, তাঁরাই বর্তমান কাশীর সবচেয়ে বড় হোর্ডার—ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

পার্শ্বনাথের দুশো বছর বাদে অপর এক রাজপুত্র ব্যক্তিগত বোধির কথা প্রথম প্রচার করেন এই কাশীরই উপান্তে—সারনাথে। তাঁর মতে, মানুষ শান্তি পেতে পারে তাঁরই প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ মার্গে। যদি দৈনন্দিন জীবনে মানুষ নিষ্ঠাভরে ওই আটটি পথ মেনে চলে তাহলে অনিবার্যভাবে তাঁর অন্তঃকরণ হবে পরিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ অন্তঃকরণ বলে পরম জ্ঞান হবে সহজলভ্য। বুদ্ধদেবের এই বাণী

কাশীর এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর পুত্র 'যশ'-কে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করল। যশ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে সারনাথে গড়ে তুললেন ওই নবীন ধর্মের প্রথম সংগঠন। স্থাপিত হল বৌদ্ধ সংঘ ও মঠ সারনাথে।

বুদ্ধ-পরবর্তী প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে প্রাধান্য অর্জনের তুমুল লড়াই চলেছে বৈদিক হিন্দু ধর্মের। শেষ পর্যন্ত শংকরাচার্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মকে পুনর্গঠিত করে নতুনভাবে অভিষিক্ত করলেন। সেই সঙ্গে প্রবল বেগে আবার শুরু হল দেবার্চনা, দান, তীর্থযাত্রা, তীর্থস্নান।

অস্সী ঘাট এখন অনেকটা দূরে। একটি একটি করে ঘাট ছাড়িয়ে নৌকা এগিয়ে চলেছে উত্তরে। মৎস্য পুরাণ মতে বারাণসীর দক্ষিণ সীমা অস্সী, উত্তরে বরণা। পশ্চিমে পাশ-পানি গণেশ, পূর্বে গঙ্গা। উত্তর-দক্ষিণে পাঁচ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে চার থেকে পাঁচ মাইল। আধুনিক বারাণসী আজ এর দু'গুণেরও বেশি। বারাণসীর স্থান-পরিচিতির গ্র্যাণ্ড ডিরেক্টরি কাশীখণ্ডে পুণ্যার্থীদের পুণ্যার্জন ও মোক্ষলাভের গাইডেন্স হিসাবে তাবৎ তীর্থ ও মন্দিরের বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে। ওই বর্ণনা অনুযায়ী কাশীতে (ক) স্থল তীর্থের সংখ্যা, —৫ (খ) স্তম্ভ—২, (গ) গুহা—২, (ঘ) পুকুর ও সরোবর—১৫১, (ঙ) কূপ—২৩, (চ) বাপী—৬ এবং (ছ) গঙ্গাতীরবর্তী—৯৯। মোট ২৮৮টি।

আর মন্দির—(ক) শিব—৫১৩, (খ) বিষ্ণু—৪৯, (গ) দেবী—৭৫, (ঘ) বিনায়ক—৭১, (ঙ) স্কন্দ—৩, (চ) সূর্য—১৩, (ছ) ভৈরব—১১, (জ) বেতাল—১, (ঝ) যোগিনী—৬৪, (ঞ) শিবগম—৮ এবং (ট) নাগ—৩। মোট ৮১১টি। তীর্থ ও মন্দির মিলিয়ে পুণ্যক্ষেত্র মোটমাট ১০৯৯টি। অবিশ্যি এর মধ্যে সবার মাহাত্ম্য গুরুত্বে সমান নয়। লিঙ্গ পুরাণ মতে প্রধান তীর্থ ও মন্দিরের সংখ্যা ৪৬২। আর কাশীখণ্ডের মতে ৩৮৩টি।

শ্রীবাস্তবজী থামলেন। পাথরে বাঁধানো ঘাটগুলির মাথায় মাথায় শ্বেত, রক্ত ও গোলাপী রংয়ের ছোট বড় মাঝারি নানা সাইজের মন্দির। মন্দিরের গায়েই ছত্র। বিকেল পড়ে আসছে। বড় বড় মন্দিরের চূড়ার আড়ালে নীল আকাশে সবে রঙ ধরছে। পটেকরজীর হু' চোখ আকাশে স্থির। গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছে গাদা গাদা গাঁদা ফুলের মালা। ওই মালার দিকে তাকিয়ে শ্রীবাস্তবজী বলতে লাগলেন, গাঙ্গুলী, পহেলা তীরথ্ যাত্রা, দুসরে মে তীরথ্ আস্নান।

তীর্থস্নান মানে কাশীতে গঙ্গাস্নান। পবিত্র গঙ্গানীরে স্নান করলেই যুগার্জিত তাবৎ পাপ ধুয়ে মুছে সাফ। তারপর মন্দিরে গিয়ে কর দেবার্চনা। সবশেষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র আতুরকে কর দান। হিন্দুর পক্ষে এর চেয়ে বড় পুণ্যকর্ম আর কি হতে পারে?

এই পুণ্যকর্মকে সহজ করার জন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গঙ্গার পাড়ে একের পর এক ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন রাজা, মহারাজা, জমিদাররা। এখন সেই কাজ ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা।

বাধা দিলাম শ্রীবাস্তবজীকে—সবসুদ্ধ ক'টা ঘাট?

মনে মনে যেন হিসেব কষে নিলেন সমাজবিদ্যার অধ্যাপক। তারপর বললেন—আশীর ওপর।

—এসব ঘাট কোন সময়ে বাঁধানো হয়েছে শ্রীবাস্তবজী?

—সপ্তদশ শতাব্দীতে মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা ও আদিকেশব—এই তিনটি ঘাট মোটে বাঁধানো ছিল। আর সবই ছিল কাঁচা। এই যে বিশাল সব পাথরের ঘাট দেখছ, সবই অষ্টাদশ শতাব্দীর। গঙ্গার পাড় ধরে টানা প্রায় তিন মাইল শুধু ঘাটের পর ঘাট। সব পাথরে বাঁধানো। এর অধিকাংশই পেশোয়ারদের হিন্দুপ্রীতির নজরানা। শুনেছি আদিঘাটে মণিকর্ণিকা বাঁধানো হয়েছিল আজ থেকে ৬৭৮ বছর আগে—সেই ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে।

—শ্রীবাস্তবজী, একটু আগে বলেছিলেন, গঙ্গার তীরে ৯৯টি তীর্থের

উল্লেখ রয়েছে কাশীখণ্ডে। এইসব ঘাট কি সেই সব তীর্থের সঙ্গে জড়িত ?

—পুরাণ তো তাই বলে। অস্‌সী ঘাট থেকে বরণা-সঙ্গমের মধ্যে ছিল এই নিরানব্বুইটি তীর্থ। এর মধ্যে বরণা-সঙ্গম ও রাজঘাটের মধ্যে ছিল পঁচিশটি তীর্থ। আজ আর তাদের কোন চিহ্ন নেই। ঘাটও নেই। তীর্থের কথাও মানুষ বিস্মৃত। শুধু ওই কাশীখণ্ডেই এদের যা উল্লেখ পাওয়া যায়।

সমাজবিদ্যার অধ্যাপক কাশীর ইতিহাস ও পুরাণ সব গুলে খেয়েছেন। কাশীতে এসে আলাপ হওয়া ইস্তক ঘুরেফিরে বহুবার জানতে চেয়েছি শ্রীবাস্তবজীর নিজের কথা। সে ব্যাপারে মানুষটা একেবারে সাইলেন্ট। জিজ্ঞাসা করলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ওল্ড ম্যান গিভেন টু ওল্ড মংক রাম। জান গাঙ্গুলী, অব অল ইণ্ডিয়ান ড্রিংকস রামটাই সবচেয়ে ম্যাচিওর। ইট উইল নেভার ফেইল ইউ। আর সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। সমাজ বল, সংসার বল, জগৎ বল, জীবন বল—অল ফলস। আমি কিসস্যু বিশ্বাস করি না।

কিন্তু এই মুহূর্তে যে ভাবে কাশীর পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম, মন্দির, তীর্থ ও ঘাটের ইতিহাস অনর্গল বলে চলেছেন, অতি বড় ধর্মবিশ্বাসী কোন হিন্দুর কথা তো জানি না, যিনি এতটা মনোযোগ দিয়ে কাশীকে চিনেছেন, জেনেছেন। অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে এই পরম নাস্তিকের কথা শুনে চলেছি।

রাজঘাট মহিষাসুর তীর্থের পদতলে। পুরাণ মতে দেবী দুর্গা ওইখানে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। বাণ-তীর্থের গায়ে প্রহ্লাদ ঘাট। তারপর গো-প্রতারা তীর্থের নয়াঘাট। ওই নয়াঘাটকে আগে বলত ফুটা ঘাট। পিলিপ্পিলা ও পিশঙ্গিলা তীর্থের গায়ে ত্রিলোচন ঘাট। নর-নারায়ণ তীর্থের গায়ে মাহাতা ঘাট। গাইঘাটের ওপর নাগেশ্বর তীর্থ। কর্ণাদিত্য তীর্থের গায়ে রাজমন্দির পুস্তা। ব্রহ্মাঘাটের ওপর ভৈরবতীর্থ। দুর্গাঘাটের ওপরেই ব্রহ্মচারিণী দুর্গার

মন্দির। খর্ব-নৃসিংহ তীর্থের গায়ে নরসিংহ-দ্বার। পঞ্চানন্দ তীর্থের নীচেই পঞ্চগঙ্গা ঘাট। ওই ঘাটেরই একাংশের নাম কোনিয়া ঘাট। তোমরা বাঙালীরা যাকে বল কন্যা ঘাট। রামতীর্থের গায়ে রামঘাট। আর বিঘ্নেশ্বর ঘাট বা গণেশ ঘাটের ওপরেই বিঘ্নেশ্বর তীর্থ। সংকট মন্দিরের উল্টো দিকে হরিশ্চন্দ্র মণ্ডপ। ওই মণ্ডপই মণিকর্ণিকা কুণ্ডের উত্তর সীমা। মাইলখানেক লম্বা ওই কুণ্ড খুব সরু একটা নালা। ওই নালার দক্ষিণতম প্রান্তে চৌষট্টি ঘাটের দক্ষিণে গঙ্গামহল ঘাট। গঙ্গা ওই কুণ্ডকে গ্রাস করে ফেলেছে। আরো দক্ষিণে ললিতা ঘাটের ওপর ললিতা তীর্থ। তার দক্ষিণে মীরাঘাটের ওপর বিশালাক্ষী ও জরাসন্ধ তীর্থ। তারপরই প্রয়াগ তীর্থের ঘাট ঘোড়া ঘাট। এখন নাম হয়েছে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাট।

—ঘোড়া ঘাট—নামটা তো বেশ বিচিত্র শ্রীবাস্তবজী।

—ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি যে জড়ানো এই ঘাটে। ইতিহাসের হিন্দুপর্বে এই ঘাটেই কাশীর রাজারা দশ দশটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এইটিনথ সেনচুরি পর্যন্ত ওই যজ্ঞের প্রতীক হিসাবে ওই ঘাটে একটা পাথরের অশ্বমূর্তি ছিল। পরে বৃটিশ অফিসাররা ওই অশ্বমূর্তি তুলে নিয়ে যান। এখন ওই মূর্তিটি দেখবে সংকটমোচন মন্দিরের সামনে রয়েছে।

এর পর দশাশ্বমেধ ঘাট। অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে জড়িত এই নাম। অনেকে বলে, ওই ঘাটেই ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কাশীখণ্ড বলছে, তা নয়, ব্রহ্মযজ্ঞ হয়েছিল অহল্যাবাঈ ঘাটে, যার ওপরে রুদ্রেশ্বর তীর্থ। এর পর আসছে পরপর যোগিনী তীর্থের রানামহল ঘাট ও চৌষট্টি ঘাট। গঙ্গাকেশব ও গঙ্গাদিত্য তীর্থের গঙ্গামহল ঘাট। একসময় এইসব তীর্থে তীর্থাধিপতিদের মন্দির ছিল। কিন্তু ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঠান আক্রমণে সমস্ত মন্দির ধ্বংস হয়। পরে, বহু পরে বিভিন্ন রাজা মহারাজা নতুন করে ওই সব মন্দির ও ঘাট পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু সেই সময় নিজেদের অস্তিত্বকে অমর করার তাগিদে

তাঁরা ওই সব ঘাটেরও নাম বদলে দেন। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। সোমেশ্বর তীর্থ আগে ছিল আজ যেখানে পাণ্ডে ঘাট সেইখানে। পরে ওই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান মানমন্দির ঘাটের কাছে।

মানমন্দির ঘাট—নামটা খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে। খুব শোনা। কেন শুনেছি? শ্রীবাস্তবজী বলে চলেছেন, পুরোনো সোমেশ্বর ঘাটের নাম আজ পাণ্ডে ঘাট। কোন এক পাঁড়েজী ওই ঘাটটা বাঁধিয়ে স্বনামাঙ্কিত করে গিয়েছেন। ওই ঘাটেরই একাংশের নাম বাবুয়া পাণ্ডে ঘাট। এ রকম বেশ কয়েকটা আধুনিক ঘাট আজ গঙ্গার পাড়ে রয়েছে, যাদের নাম নির্মাতাদের নামের সঙ্গে জড়িত। যেমন লাল ঘাট, রাজা ঘাট, বিনায়ক রাও ঘাট।

জানো গাঙ্গুলী, সব ঘাটের মধ্যে মাহাত্ম্য ও প্রাচীনত্বে সবচেয়ে ইমপরট্যাণ্ট মণিকর্ণিকা। ইতিহাস বলে, দুই রাজভ্রাতা ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘাটটি বানিয়েছিলেন। তাঁদের নাম আজ হারিয়ে গিয়েছে। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া বাজীরাও এই ঘাটটির খানিকটা বাঁধিয়ে দেন। মহারানী অহল্যাবাঈ গোটা ঘাটটা নতুন করে বাঁধান ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। তবে বর্তমান ঘাটটি কে কবে ১৮৭২-এর পর বাঁধিয়ে দিয়েছেন তা জানা যায় নি।

পাথরে বাঁধানো ঘাটগুলির বয়সে মণিকর্ণিকার পরই প্রবীণ পঞ্চগঙ্গা ঘাট। ইতিহাস বলে, জনৈক রঘুনাথ ট্যাণ্ডন ওই ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে। গাঙ্গুলী, যে কোনদিন শেষ রাতে ওই ঘাটে যদি যাও, দেখবে এই কার্তিকের শীতেও হাজার হাজার মানুষ স্নান করছে। কার্তিক মাসে ওই ঘাটে স্নান করলে নাকি স্বর্গবাস সরকারী প্রমিসরি নোটের মত অক্ষয়। দেখবে নাকি একবার ট্রাই করে?

হেসে জবাব দিই—রাম কহো। তবে শীতের জন্য নয়। গঙ্গার

যা ছিরি। ভয় হয়, এই জলে নামলে ডাক্তারী বই-এ লেখা সব ক'টি রোগ একবারে ছেঁকে ধরবে।

—ঠিক বলেছ। শ্রীবাস্তবজী বলেন, কাশীর গঙ্গায় কতটা জল হিমালয়ের আর কতটা এই শহরের ও আশপাশের কলকারখানা ও মিউনিসিপ্যালিটির নোংরা জল তার হিসেব কে দেবে? সেদিন বি. এইচ. ইউ-র একদল সায়েনটিস্ট বলছিলেন, কাশীর গঙ্গা পলিউটেড। হায় সর্বপাপহারিণী, আজ তোমার দেহ-পাপ দূর করার ক্ষমতাটুকুও তোমার নেই। যাক এ সব কথা। তোমরা বাঙ্গালীরা যে ঘাট সম্পর্কে সবচেয়ে স্পর্শকাতর—ওই ছ্যাখ সেই দশাশ্বমেধ ঘাট।

তাকিয়ে দেখি, সন্ধ্যার ছায়া জল ছুঁয়ে ঘাটের চত্বরে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক ডজন নৌকা, গুটিকয়েক বজরা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির ওপর পরপর ছাতা ছড়ানো। ওই সব ছাতার নীচে, পাশে কাঠের বাক্স সাজিয়ে ফুল, প্রদীপ, দহিবড়া, ফুচকা, পান, সিগারেট নিয়ে বসে গিয়েছে ব্যাপারীরা। ঘাটের ওপরে মন্দিরের গায়ে ঝুলছে লাউড স্পিকার। ভজন ভাসছে বাতাসে। নীচে ভট ভট করে একটা পাম্প চলছে। ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখলাম, সিঁড়ির ওপর বর্ষায় জমা পলির পাহাড় ধুয়ে সাফ করা হচ্ছে। চমৎকার ঝাড়ুদারী। পাইপ দিয়ে গঙ্গার জল তুলে তোড়ে চার্জ করা হচ্ছে ওই পলির পাহাড়ে। জলই ধুয়ে দিচ্ছে মাটির চাঁই। আর একটু একটু করে মাটির আস্তর খসিয়ে বেরিয়ে আসছে পাথরের ঘাট। ঘাটের গায়ে টুরিস্টদের দরদাম চলছে। ওই ভিড়ের মধ্যে এক মহিলা দেখি শালপাতার টুকরিতে পাঁচ প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন। কার পুণ্য কামনায় কে জানে? সন্ধ্যা যদি থাকত, ও কি প্রদীপ ভাসাত? ভাসালে কার জন্য?

শুনতে পাচ্ছি শ্রীবাস্তবজী বলছেন, ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া বাজীরাও এই ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। মাঘ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ঘাটে পুণ্যস্নানের মেলা বসে। তোমরা বাঙ্গালীরা দুর্গা ও কালীর

ভাসান দাও এই ঘাটে। বিকেলে দেখবে হাজার হাজার বাঙ্গালী বিধবা এই ঘাটে বসে কীর্তন শুনছেন। বাই দ্য বাই গাঙ্গুলী, ওই বিধবাদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলে? তোমাদের বাংলা সাহিত্যে বিধবাদের তো কাশী ছাড়া গতি নেই।

—এক সময় এ কথা নিশ্চয় সত্যি ছিল শ্রীবাস্তবজী। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অসহায় বিধবা নায়িকারা কোথাও কোন আশ্রয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটে আসত এই কাশীতে। আজ সমাজ অনেক বদলে গিয়েছে। তবু হয়তো আজো কেউ কেউ আসে। আমি এখানকার বাঙ্গালী উদ্বাস্তু বিধবাদের খোঁজ নিয়েছি। সংখ্যায় তাঁরা বেশি নন। বেশি ট্র্যাডিশনাল বিধবারা। কাশী ছেড়ে যাওয়ার আগে বাঙ্গালীটোলায় গিয়ে তাদের খোঁজ নিশ্চয় নেব। দশাশ্বমেধ ঘাটের কথাও মনে থাকবে। এখানেই তো ওঁরা বিকেল বেলা আসেন।

নৌকো ততক্ষণে দশাশ্বমেধ ঘাট ছাড়িয়ে চলেছে উত্তরে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, এক জায়গায় যেন অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। নৌকো যত এগোচ্ছে তত ওই মশালগুলো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ডঃ পটেকর গম্ভীর উদাস গলায় বললেন—ওই তো মণিকর্ণিকা।

মণিকর্ণিকা? তাহলে যেগুলোকে মশাল ভেবেছিলাম, সেগুলো আসলে চিতার আগুন। কতগুলি চিতা জ্বলছে? এইসব চিতাই তো কৈলাস চৌধুরীর রাজত্ব। এই চিতার আয় থেকেই চলে ডোমরাজার ঠাট-বাট। কাশীতে ডোমরাজা কৈলাস চৌধুরী রীতিমত একটি নাম। যেন কিংবদন্তীর পুরুষ। লোকে বলে, মণিকর্ণিকায় যত মড়া পোড়ে, তত কৈলাসের মুখে হাসি ফোটে।

এতক্ষণে মনে পড়েছে। মানমন্দির ঘাটের নাম শুনেই তখন থেকে ভাবছিলাম। ওই ঘাটই তো ডোমরাজা কৈলাস চৌধুরীর ঠিকানা।

পকেটের নোটবুকে ঠিকানাটা টুকেও রেখেছি—ডি ৫।৮৭, মানমন্দির ঘাট, বেনারস। কোথায় সেই ঘাট?

সেই প্রশ্নই করলাম শ্রীবাস্তবজীকে।

ঘাটের পর ঘাট পেরিয়ে যাচ্ছে। শ্রীবাস্তবজীর ডান হাতটা ঈষৎ দক্ষিণে পাড়ের দিকে উঠে গেল, ওই তো মানমন্দির ঘাট। ওই যে জোড়া বাঘ ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে, ওই বাড়িটাই কৈলাসের।

কোথায় জোড়া বাঘ? সামনে নদীর পাড় জুড়ে বিশাল বিশাল প্রাসাদ। সব পাথরের। কোনটা মন্দির, কোনটা ছত্র। এর মধ্যে হাসপাতালও আছে। আবার কোন প্রাসাদ অবস্থার ফেরে এখন একেবারে কলকাতার ফ্ল্যাট বাড়ি। বারান্দায়, ছাদের ওপর মানুষজনের চলাফেরা অন্ধকারে ঠিক যেন ছায়া ছায়া ছবি। বিকেলে দেখেছিলাম কয়েকটি ঘাটে রাজ্যের শাড়ি, ধুতি, জামাকাপড় শুকোচ্ছে। বারাণসীর ধোপাদের আড়ং-ধোলাই-এরও পাইকারী ব্যবস্থা এই গঙ্গার ঘাটে। কোন কোন ঘাটে মহিষের পাল সিঁড়ি ভেঙ্গে নামছিল জলের কিনারায়। এখন ইলেকট্রিক লাইট, ব্যাপারীদের গ্যাস-লাইট, নদীর জলে ভাসমান পঞ্চপ্রদীপের আলোয় সব সিল্যুয়েট। এর মধ্যে জোড়া বাঘ মার্কা বাড়িটা কোন্‌টা?

কয়েক সেকেণ্ড সেই দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে চোখ জোড়া ক্যামেরার মত প্যান করে দক্ষিণ থেকে উত্তরে আনতে গিয়েই দেখি সাদামাঠা ছোট একটা ঘাটের ওপর দুর্গের প্রাকারের মত খাড়া এক পাঁচিলের মাথায় পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই পাথুরে বাঘের সিল্যুয়েট। পেছনের নিয়ন আলো যেন অন্ধকারে খোদাই করে রেখেছে ওই দুই প্রস্তর ব্যাঘ্র।

মিনিট কয়েক বাদে নৌকা এসে ভিড়ল মণিকর্ণিকার ঘাটে। কোথায় ঘাট? নৌকায়-নৌকায় সব সিঁড়ি অদৃশ্য। সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে এক ডজন চিতা। ধোঁয়া, চড়চড় করে কাঠ ফাটার

আওয়াজ, ডোমদের চিৎকার, অন্ধকার আকাশে থেকে থেকে চিতা থেকে ছিটকে ওঠা আগুনের স্ফুলিঙ্গ। মৃতদের চিতায় সঁপে নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীরা নীরবে সিঁড়িতে, ঘাটের চাতালে, প্রাচীরের গায়ে দাঁড়িয়ে। অধিকাংশই স্থানীয়। স্থানীয় বলতে বেনারস জেলা ছাড়াও পূর্ব ইউ. পি. ও পশ্চিম বিহারের সব জেলার মানুষ। তাছাড়া অক্ষয় স্বর্গবাসের আশে সেই বোমবাই, সেই দিল্লী, ওধারে পাটনা, গয়া থেকেও আসছে মুর্দা। জীয়ন্তে যার কাশীবাস ঘটে নি, মরণের পর সম্পূর্ণ অজান্তে কাশীতেই নশ্বর দেহ তার পরিণত হচ্ছে চিতাভস্মে। এর সবটাই কী বিশ্বাস? নাকি কিছুটা অভ্যাস, কিছুটা ঐতিহ্যে ভয় ও আসক্তি?

নৌকোর গলুইগুলি পরপর সার সার গায়ে গায়ে লাগানো। ওই কাঠের পাটাতন হেঁটে পার হয়ে এসে দাঁড়ালাম পাথরের সিঁড়িতে। কাশী বলে, মণিকর্ণিকায় কোনদিন নাকি চিতার আগুন নেভে নি। কাশী বিশ্বাস করে—ওই আগুন যেদিন নিভে যাবে, সেদিন মহাপ্রলয় ঘনিয়ে আসবে। বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ প্রস্তরীভূত শিলাখণ্ড ছেড়ে ধ্বংসের তাণ্ডবে নটরাজ রূপে আবির্ভূত হবেন।

সেই সমূহ বিনাশের মুহূর্ত যখন আসে আসুক, তার আগে মণিকর্ণিকার চিতাধিপতির সাক্ষাৎ যে একবার চাই। কোথায় ডোমরাজা কৈলাস?

শ্রীবাস্তবজী বললেন, আগে ওপরে চল। কৈলাস বা তাঁর কোন লোক আমাদের জন্য ঘাটের ওপর বাঁধানো ছত্রে অপেক্ষা করবে।

আমরা তিনজন ওপরে উঠতে লাগলাম। গা-ঘেঁষে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামছেন মানুষজন। কারো হাতে কাদার তালে ঢাকা নাভি-কুণ্ডল। কারো হাতে শূন্য কলসী। এখনই গঙ্গা পূর্ণ করে দেবে।

পাঁচ

গেটের ওপর এসে দাঁড়ালাম। পাথরে বাঁধান চাতাল। সিঁড়ির দু' দিকে মানুষ-উঁচু পাঁচিল। বাঁ-ধারে দাহকারীদের থাকার জন্য পাথরে বানানো বিশাল ছত্র। ডানদিকে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। ওই ফাঁকা জায়গার পর থেকেই শুরু মণিকর্ণিকার গলি। চওড়ায় বড়জোর চার থেকে পাঁচ ফুট। দু' ধারে একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ি। বাড়িগুলির একতলায় ছোট ছোট খুপরি। কোন খুপরীতে বিক্রি হচ্ছে শবদাহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সেই সঙ্গে এক টুকরো লাল কাপড়। বাঙালী যেমন মৃতকে শেষ যাত্রায় সাদা কাপড়ে ঢেকে দেয়, হিন্দিভাষী উত্তর ভারত দেয় লাল কাপড়ে মুড়ে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। টাকাকড়ি থাকলে ওই লাল শালুই হবে সিল্ক বা মখমলের আর নিতান্ত গরীব হলে হাতে বোনা তাঁতের। পাশেই বিক্রি হচ্ছে কোন খুপরিতে বেনারসের বিখ্যাত রাবড়ি-মালাই। উনুনের ওপর পেতলের কড়াইতে সারাদিন ধরে দুধ জ্বাল চলছে। পাশেই পেতলের পরতে সরটুকু তুলে রাখছে দোকানদার। পঁচিশ টাকা কিলো। পথচলতি বাবা বিশ্বনাথের বাহনরা উদাস মুখে মাঝে মধ্যে ওই পেতলের পরতে নাক ডুবিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ রৈ রৈ। উদাসী ষাড় দু' একটা গুঁতো খেয়ে মুখ বেঁকিয়ে আবার চলমান।

পানের দোকান, তার পাশেই গুলির দোকান। সিদ্ধিপাতা বেটে বানানো এক একটা গুলির দাম পনেরো পয়সা। সবুজ গোটা চারেক গুলির সঙ্গে একশ কি দেড়শ গ্রাম মালাই খেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তুরীয় মার্গ ব্রহ্মরন্ধ্রে।

গলির ভেতরেই হাজার হাজার মানুষের ঠিকানা। কেউ পায়ে কেউ বা স্কুটারে—গতি দুয়েরই প্রায় সমান, যে যার ঠিকানায় ছুটছে। মুদির দোকান, ফুলুরির দোকান, মিষ্টির দোকানের পাশেই ছোট ছোট, ঘুপচি ঘরে বিখ্যাত বেনারসী শাড়ির দোকান। সোয়াশ টাকা থেকে শুরু করে দেড় হাজার টাকা দামের শাড়ি এই সব ঘুপচি ঘর থেকে অর্ডার মত কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছে।

কৈলাস এসে পৌঁছোয় নি শুনে শ্রীবাস্তবজী, ডঃ পটেকর ও আমি ঘুরে ঘুরে মণিকর্ণিকার গলি ধরে হাঁটছিলাম। ছোট ছোট ইঁট দিয়ে বাঁধানো এই গলি। কোথাও কোন ড্রেন নেই। প্রয়োজনও নেই। এই গলি যেখানে শহরের রাজপথে গিয়ে মিশেছে হাঁটলেই টের পাওয়া যায় জায়গাটা উঁচু ঢিবির মত। পরে দেখেছি কোন সাইকেল-রিক্সাওয়ালা মণিকর্ণিকার গলির মুখ পর্যন্ত আসতে চায় না। দু' তিন জন সওয়ারি থাকলে খানিক আগেই একজনকে রেখে বাকিদের পেছন পেছন হাঁটতে বলে রিক্সাওয়ালা হাতে ঠেলে রিক্সা নিয়ে ওঠে।

কাশী শহরটা তিনটি মস্ত ঢিবির মাথায়। কাশীবাসীদের বিশ্বাস স্বয়ং মহাদেবের ত্রিশূল এই মর্ত্যের স্বর্গকে ধারণ করে রেখেছে। মণিকর্ণিকা ওই ত্রিশূলেরই একটি ফলা।

হাঁটতে হাঁটতে গলির শেষে একেবারে রাজপথে এসে পড়েছি। চার ধারে অগুন্তি সাইকেল রিক্সা, স্কুটার, টাঙা, তার মধ্যে দু একটা মোটরগাড়ি। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা ভাঙ্গার পর রাজভবনের সামনে জনস্রোতে যেমন মোটরগাড়িগুলো মোচার খোলা হয়ে যায় ঠিক তাই। গলির দু' ধারে পানের দোকান। ঢুকতে বেরোতে লোকে পান কিনছে। পান খেতে খেতে গল্প করছে। কাশীর এই ব্যাপারটা রীতিমত মজাদার। যে কোন রাস্তায় দিনের যে কোন মুহূর্তে চোখে পড়বেই। দুই পানখোর গল্প করছে, পাছে পানের পিকটুকু পড়ে গিয়ে নষ্ট হয় তাই দু'জনেরই ঠোঁট প্রায় বন্ধ ও

উর্ধ্বমুখী। কে :য কি বলছে বোঝা দায়। তবু দেখেছি ওই মাইম কাশীবাসীদের কাছে রীতিমত সুবোধ্য।

রাম নাম সৎ হ্যায়।—একের পর এক মড়া জ্যান্ত মানুষের কাঁধে চেপে ওই গলিতে ঢুকছে। আধঘণ্টার ভেতর অন্তত ছটি ঢুকল। ঘড়িতে বাজে আটটা। আকাশে জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। এতক্ষণে নিশ্চয় কৈলাস চৌধুরী এসে গিয়েছে। একদল শবযাত্রীর পেছনে পেছনে আমরাও শ্মশানমুখী হলাম। মণিকর্ণিকার গলির গোলকধাঁধায় শবযাত্রীরাই সঠিক নিশানা। মিনিট চারেক হাঁটার পর ডানদিকে একটা ছোট ঘরের সামনে এসে শবযাত্রীরা দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখি ওই ঘরের লোহার দরজার মাথায় হিন্দিতে লেখা বেনারস নগর-মহাপালিকার মড়া পোড়ানোর অফিস। লোহার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মহাশ্মশানের প্রায় সম-সাময়িক একটি কাঠের টেবিলে একটা হ্যারিকেন। তারই আলোয় টুলে বসে এক ভদ্রলোক রসিদ লিখছেন। কলকাতায় কেওড়াতলা, নিমতলা বা কাশী মিত্তিরের ঘাটে শবদাহ করতে গেলেই করপোরেশনের ডাক্তারবাবু সবার আগে চাইবেন ডেথ সারটিফিকেট। আর সেই সারটিফিকেট কোন না কোন ডাক্তারের হওয়া চাই। আবার ডাক্তারের সার্টিফিকেট হলেই হবে না। ঘাটবাবু বা রেজিস্ট্রারবাবু, যিনি নিজেই স্ব-গুণে ডাক্তার, মৃতদেহের সঙ্গে সারটিফিকেটের মৃত্যুর কারণ মিলিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হলে তবেই দেন অনুমতি। কাশীতে সে বালাই নেই। নগর-মহাপালিকার ঘাটবাবু নিছকই কেরানীবাবু। সারটিফিকেট বলতে যে গ্রাম বা মহল্লা থেকে শবদেহ এসেছে সেখানকার সরপঞ্চ বা মুখিয়ার একখানা চিরকুট। ওই চিরকুট দেখাতেই নগর মহাপালিকারও অনুমতি-কুট হাতে হাতে লভ্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম।

রোজ গড়ে সত্তর থেকে আশিটা মড়া আসে মণিকর্ণিকায়। শীতকালে মাঝে মাঝে একশ থেকে সোয়াশ হয়ে যায়। তুলনায় হরিশচন্দ্র ঘাটে কম। দিনে গড়ে পঁচিশ থেকে তিরিশ।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সরপঞ্চ বা মুখিয়াদের চিরকুট দেখে ঘাটবাবু নগর-মহাপালিকার শীলমোহর আঁকা একটুকরো সাদা কাগজে হিন্দিতে দস্তখৎ দিতে দিতে বেনারসের তিনটি প্রধান ইনডাসট্রির অন্যতম শবদাহের ইকনমিকসের খানিকটা হিসেব মুখে মুখেই দিলেন। ট্যুরিজম, পুজো ও মড়া পোড়ানো—এই তিনটি আধুনিক বেনারসের জীবন ও জীবিকার প্রাচীনতম তিন সূত্র।

বেনারসে ইলেকট্রিক চুল্লী নেই। মৃতদেহ সৎকার হয় আদি পদ্ধতিতে। শ্মশান দুটি—মণিকর্ণিকা ও হরিশচন্দ্র। বৈশাখ টু চৈত্র দৈনিক গড়ে একশটি মড়া পোড়ে এই দুই ঘাটে। মড়া পোড়ানোর জন্য কাঠ লাগে। ছ' জন কাঠের ঠিকাদার দুই ঘাট আগলে বসে আছেন। কাঠের মণ চোদ্দ টাকা। একজন ভিখারীকে পোড়াতেও খুব কম করে পাঁচ মণ কাঠ লাগে। আমীর হলে তেরো চোদ্দ মণ। গড়ে ন মণ ধরলে একশ মড়ার জন্য রোজ লাগছে ন'শ মণ কাঠ। আর ওই কাঠের দাম খুব কম করেও সাড়ে বারো হাজার টাকা। যে নৌকোয় ইউ. পি, বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বন-জঙ্গল উজাড় করে কাঠ আসছে, সেই নৌকোই আবার নিয়ে আসছে মৃতদেহ। এই কাঠের ব্যবসায় জড়িত মাঝি-মাল্লা, কাঠুরে, ঠিকাদারের লোকজন ধরে কয়েক হাজার মানুষ।

দুই মহাশ্মশানের ঘাটে বসে আছে ডোমরাজা কৈলাস চৌধুরীর জ্ঞাতি-গুষ্ঠীরা। গড়ে মড়া পিছু অন্তত একশটি টাকা না দিলে কোন ডোম মড়া ছোঁবে না। অর্থাৎ দৈনিক মড়া পোড়ানোর চার্জ বাবদ ডোমদের আয় দশ হাজার টাকা। এই টাকার অর্ধেক পাবেন কালু ডোমের বংশধর কৈলাস। বাকি অর্ধেকের পঞ্চাশ ভাগ যেদিন যার ঘাট তাঁর। আর বাকি পঞ্চাশ ভাগ মজুর-ডোমরা।

অঙ্কটা গোড়ায় খুব জটিল মনে হচ্ছিল। কৈলাসের দৈনিক রোজগার পাঁচ হাজার টাকা এটা বুঝতে পারছি, কিন্তু তারপরের হিসাবটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না। বুঝিয়ে দিলেন সমাজবিদ্যার

অধ্যাপক শ্রীবাস্তবজী। বললেন, তোমাদের কালীঘাটের কালীবাড়ির কথা ভুলে গেলে? বছরে তিনশ. পঁয়ষট্টি দিনই তো মা কালীর পুজো হচ্ছে। কিন্তু রোজ কি একই লোক পুজো দেয়। মূল পূজারী বংশ গত কয়েক শ বছরে শাখা প্রশাখায় লতায় পাতায় আজ কয়েক শ। ওই লতাপাতাদের কারো ভাগে বছরে একদিন, কারো বা এক বেলার পুজো পড়ে। একে বলে প্যালা। ঠিক তেমনি কৈলাস কালু ডোমের ডাইরেকট ডিসেনড্যানটের দাবিতে অনুপস্থিত জমিদারের মত সব প্যালার অর্ধেকটা তুলে নিচ্ছে। বাকি অর্ধেকটা ডোম বংশের ছোট, মেজ তরফের শরিকরা পাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে মণিকর্ণিকার ঘাটে এসে শুনি কৈলাস আসে নি। তবে লোক গিয়েছে খবর আনতে, আজ আদৌ আসবে কি না? বসে বসে ঘাটোয়াল হরিনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছিলাম। কৈলাসেরই জ্ঞাতি ভাই। বাঁধানো চত্বরের অন্ধকারেও হরিণারায়ণের পোড়া তামাটে মুখে গ্রীক ভাস্কর্যের আদল স্পষ্ট। বছর ত্রিশেক বয়স। লালবাজারের গোয়েন্দা কনসটেবলের মত ফিনফিনে ধুতির ওপর ঘিয়ে রংয়ের সিল্কের পানজাবি পরা। ধুতি হাঁটুর ওপর তুলে কোলে নসিং রংয়ের শালটা দলা পাকিয়ে বসে। সামনে দুটি পাথরের মাঝখানে বড় বড় খানকতক চ্যালাকাঠ জ্বলছে। ওই চ্যালাকাঠের আগুনটুকু বড় দামী, বড় পবিত্র। কালু ডোমের মুখ্য উত্তরাধিকার। মৃতের মুখাগ্নি করতে হলে চাই ওই আগুন। পাটকাটির ডগায় ওই আগুন ধরাতে এসে জৌনপুরের এক কিশোর হরিণারায়ণের হাতে দুটি দশ ও একটি টাকা দিয়ে বলল, ভাগচাষী বাপ যাওয়ার আগে এর বেশি আর কিছু রেখে যেতে পারে নি। আমরা সামনে বসে আছি বলে কিনা জানি না, হরিনারায়ণের অবিশ্বাসী চোখজোড়া কিশোরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা জৌনপুরী চাষীদের পেল্লায় পাগড়িতে ঢাকা মাথাগুলোয় টর্চ ফেলতে ফেলতে এসে ঠেকল পবিত্র ধুনিতে। ভারী গলায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হল আদেশ—লে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে চটপট আওয়াজে এক মুঠো পাটকাঠি মশাল হয়ে উঠল। নীচে সিঁড়িতে আওয়াজ উঠল রাম নাম সৎ হ্যায়। নদীর পাড়ে তৈরি একটি চিতা মিনিট খানেকের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

দু' বছর বাদে তিন দিনের জন্য হরিনারায়ণের কপালে ঘাটোয়ালি জুটেছে। ঘরে বৌ, চারটি ছেলেমেয়ে। হরিনারায়ণের জিভ একেবারে চাঁছাছোলা। ডোমের ছেলে ডোম। কিন্তু তাই বলে তার তো আর কৈলাসের কপাল নয়। তিন দিনের আয়ে দু'বছরের খোরাকি তুলতে হবে। কৈলাসের হিস্যা মিটিয়ে দিতে হবে। তাই একুশ টাকার লোকসান তুলতে পরের অগ্নি-প্রার্থীকে দুম করে বলে বসল ঃ এক হাজার রূপেয়া।

এক হাজার রূপেয়া! বলে কি হরিনারায়ণ? এই সব ছেঁড়া খোঁড়া ময়লা ধুতি পরা, ততোধিক নোংরা চাদর ও পাগড়ি মোড়া, নগ্ন-পা মানুষগুলো এত টাকা দেবে কোথা থেকে? হরিনারায়ণ তার কী জানে? দিতে হয় দাও, নয় তো কাটো। তোমাদের জন্য পেছনের লোকের দেরী হয়ে যাচ্ছে। শীতকালে বিহার, ইউ পিতে গাছের পাতার চেয়েও অনেক দ্রুত বৃদ্ধরা খসে পড়ে। এই জ্যোৎস্নার রাতে তারা সবাই যেন লাইন লাগিয়ে দিয়েছে। হরিনারায়ণের বেজার মেজাজ এখন হেভি খুশ। শ্মশানে বসে সে তো আর দান করতে আসে নি। বাপ-পিতেম'র ব্যবসা। বুঝে চললে সোনার খনি। দশ মিনিটের দরদাম শেষ পর্যন্ত আটশ'য় রফা হল। এক বৃদ্ধ তাঁর কোমরের গেঁজ খুলে অনেকগুলো বড় নোট বার করে বার বার থুতুতে বুড়ো আঙুল ভিজিয়ে আটখানা হরিনারায়ণের হাতে দিতেই পবিত্র অগ্নি মঞ্জুর হোল।

ঠিক সেই মুহূর্তে খবর এল, কৈলাস আজ আর ঘাটে আসবে না। তবে শ্রীবাস্তবজীর জন্য সে বাড়িতে অপেক্ষা করছে। বাড়ি মানে তো সেই মান-মন্দির ঘাটের জোড়া-বাঘ। তাই চলুন শ্রীবাস্তবজী। কিন্তু

পটেকরজী আবার কোথায় গেলেন ? অন্ধকারে ভাল ঠাহর হয় না। তা ছাড়া ছত্তরের ভেতরে পবিত্র অগ্নির ধোঁয়ার সঙ্গে গঞ্জিকার পবিত্রতা মিলে মিশে রৌরব নরকের একটা খণ্ড-চিত্র নিখুঁত করে তুলেছে। নীচে সিঁড়ির দু' পাশে একের পর এক চিতা পবিত্র অগ্নিস্পর্শে রাম নামের মাহাত্ম্যকে উড়ন তুবড়ির স্ফুলিঙ্গ ও দমবন্ধ করা ধোঁয়ার জ্যোৎস্নার গায়ে একটা ভারী ধূসর চাদর জড়িয়ে দিচ্ছে। তাই শীত·যে কতটা ঠিক ঠাহর হচ্ছে না।

পটেকরজী সিঁড়ির প্রথম ধাপের এক কোণে বসে আপন মনে একটি তুলসীদাসী দোহা গাইছিলেন। পিঠে হাত রাখতেই চমকে উঠলেন। বললাম, চলুন কৈলাসের বাড়িতে যেতে হবে।

উঠতে উঠতে বললেন ঃ শ্মশানে এলে মন কেমন উদাস হয়ে যায়। জীবনের নাম, অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির জন্য চারদিকে যে এত লড়াই তা যে কত অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর তা বোধহয় তুলসীদাসজীর মত আর কেউ কোনদিন বোঝে নি। গান গাইতে গাইতে ভাবছিলাম, এই যদি পরিণতি তবে কি হবে কলকাতায় গিয়ে, একটু নামের জন্য গুঁতোগুঁতি করে ? তার চেয়ে এই তো ভাল আছি। ছেলে মেয়েদের গান শেখাচ্ছি। বয়স তো অনেক হল। একদিন এই ঘাটেই নীরবে চলে আসব।

ঘাট থেকে ঘাটে যাওয়ার শুঁড়িপথ বেনারসে অজস্র। হাত বাড়ালেই গঙ্গা। কিছু এইসব শুঁড়িপথ বা গলিতে ঢুকলে মনে হয় যেন পাতাল রেলের খাতে ঢুকে পড়েছি। দু' দিকে উঁচু উঁচু বাড়ি। ছোট ছোট পাথুরে ইঁটে বাঁধানো সাবেক কালের গলি। দিনের বেলা সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ, রাতে জ্যোৎস্নার। তাই এই বিশ্ব চরাচর প্লাবন করা জ্যোৎস্না রাতেও হরিনারায়ণের লোক টর্চ ফেলে ফেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কোথাও রান্নাঘরের ছাই, আনাজের খোসা রাস্তা জুড়ে। কোথাও গরু-মোষের পুরীষের পাশেই মানব

দেহের আবর্জনা গলির সিকিভাগ ঢেকে রয়েছে। দু'পা চলতে না চলতেই বাবা বিশ্বনাথের বাহনদের মুখোমুখি। তবে এরা বড় গম্ভীর। গা-ঘেঁষে গেলেও ভ্রূক্ষেপ নেই। গলি কোথাও কয়েক ধাপ নীচে নেমে আবার পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ঠেলে উঠেছে। যেতে যেতে, হাঁটতে হাঁটতে এই শীতেও টের পেলাম ঘামছি। ভারতীয়দের বৈরাগ্য, সংসার-বিমুখতা ঠিক এই ঘামের মত। অল্পতেই বেরিয়ে পড়ে। আসলে কঠোর নিষ্ঠা ও শ্রমে আমাদের ভয়। তাই সেটা ঢেকে রাখার জন্যই মাঝখানে ল্যাজ গুটিয়ে পালানোর সময় ঘোষণা করি, দূর কি হবে এসব করে। সবই তো মায়া। একদিন তো সবই ছাই হয়ে যাবে। যে অনিত্যতা বুঝতে শংকরাচার্যের মত মণীষীর এক জীবন লেগেছিল, তাই আমরা শ্মশানের এক আধ ডজন চিতার দিকে তাকিয়েই টের পেয়ে যাই। আসলে ভাবালুতার জন্য তো কোন কষ্ট করতে হয় না। ওর কোন কিস্মৎ নেই।

এসে গেছি। তাকিয়ে দেখি গলি থেকে আট দশ ধাপ শ্বেতপাথরে বাঁধানো সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গিয়েছে। এখানে গলিটা গঙ্গা-বরাবর। যদিও সামনের শ্বেতপাথরের প্রাসাদের জন্য নদী অদৃশ্য। জ্যোৎস্না সিঁড়িগুলো ধুয়ে মুছে রেখেছে।

ওপরে উঠে এসে দেখি শ্বেতপাথরের দু' মানুষ উঁচু পাথরের গায়ে পেতলের কড়া লাগানো বিশাল আবলুশ কাঠের দরজা হাট করে খোলা। সামনেই বাঁধানো উঠোন। আট দশটা গরু গোটা উঠোনটা পবিত্র গোময়ে লেপে রেখেছে। উঠোনের শেষে এল-সেপের একটা দোতলা বাড়ি। সমকোণে দুটি বারান্দা। গোটা দশ বারো কুকুর জ্যোৎস্নার মধ্যে দেউড়িতে চারটি ছায়ামূর্তি দেখে একসঙ্গে চিৎকারে গোটা মহল্লা মাথায় করে তুলল। ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দার গায়ে নিয়ন আলোয় উজ্জ্বল ঘরটি থেকে গর্জে উঠল হিন্দি সিনেমার একচেটিয়া আকবর সপ্রুর গলা : চিল্লাও মৎ।

সঙ্গে সঙ্গে সব নিথর। গলার মালিক যে রীতিমত দাপুটে লোক

মুহূর্তে তা ক্লিয়ার হয়ে গেল। আছাড় সামলানোর জন্য গোময় এড়িয়ে পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। চৌকাঠের সামনেই মেঝেতে একটি শিশু লেপ জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। ঠিক তার পাশেই জাজিমের ওপর বসে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষ। চোখ ছুটি রক্তজবা। কানে সোনার মাকড়ি। মাথার চুল নিগ্রোদের মত কোঁকড়া। গায়ে ফুল স্লীভ ছাই ছাই একটা সোয়েটার। তাঁর হাতের সামনে ছুটি দিশি মদের বোতল, গোটা কয়েক মাটির খুরি ও শালপাতার ঠোঙায় চানাচুর। কোলের ওপর একটা বালিশ। হাত ছুটি বালিশের ওপর ন্যস্ত। রক্তজবা চোখজোড়া অলসভাবে আমাদের দেখে নিয়ে বলল : আইয়ে শ্রীবাস্তবজী।

এই সেই সপ্রু। দেখে মনে হয় বয়স পঁয়ত্রিশের মত। শ্রীবাস্তবজীর পেছন পেছন ঘরে ঢুকলাম। ছোটখাট একটা হলঘর। আয়তক্ষেত্রকার। চার দেয়ালে শিব, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, ননীচোরা, কালীয়দমন ও হরিশচন্দ্র-শৈব্যা-রোহিতাশ্ব ও কালুডোম। ছবি হয়ে ঝুলছে। ঘরের পেছনের দিকে অত্যন্ত দামী ডবল খাটে জাজিম, লেপ, তোষক, কম্বল, বালিশ পাহাড় হয়ে আছে। তারই এক কোণে বসে ধুতির ওপর লংকোট ও কানঢাকা টুপি পরে মাঝারি হাইটের একটা মোটা লোক কুতকুতে চোখ দিয়ে আমাদের আপাদমস্তক পরীক্ষা করছে। খাটের আরেক কোণে মাথার ধারে ছোট একটা টেবিলের ওপর ফোন। সপ্রুর ঠিক পেছনে ওই জাজিমের ওপর কম্বল ঢাকা দিয়ে আর একটি শিশু ঘুমুচ্ছে।

—আইয়ে শ্রীবাস্তবজী আইয়ে, বৈঠিয়ে।

সপ্রুর অনুরোধে ভেতরে ঢুকে তার মুখের সামনে প্রথম শিশুটির পেছনে রাখা সোফা সেটে এসে বসলাম। বসতে বসতে শ্রীবাস্তবজী আলাপ করিয়ে দিলেন, স্বর্গীয় ডোমরাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পোতা ডোমরাজ কৈলাস চৌধুরী। আর ইনি কলকাতার মস্তুর পত্রকার গাঙ্গুলীজী।

—বাতাইয়ে গাঙ্গুলীজী আপকো লিয়ে ম্যয় ক্যা কর্‌নে সাকতা ?

বললাম, কাশীতে এসে অবধি আপনার কথা শুনছি। তাই খুব দেখার শখ ছিল। দেখতে এসেছি। একটু আধটু গপ্পো করব ব্যস।

কৈলাস যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে লংকোট মিহি গলায় বলে উঠল—কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাগজে গপ্পো ফাঁদবেন ?

প্রশ্নটা বেয়াড়া। লোকটির স্বর মিহি হলেও বিদ্রূপ বেশ স্পষ্ট। এ কৈলাসের কে ? সেটা আগে জানা দরকার। কিন্তু যতভাবেই প্রশ্ন করি, সবই অমায়িক ভদ্রতায় পাশ কাটিয়ে ফিরে ফিরে পাল্টা প্রশ্নঃ কাশীতে অ্যাতো দেখার জিনিস। বাবা বিশ্বনাথ, সংকট মোচন, দুর্গাবাড়ী, আনন্দময়ীজীর আশ্রম, তুলসী মন্দির, গঙ্গার অ্যাত শত ঘাট, সব ছেড়ে কেন ডোমের ব্যাটা ডোম কৈলাসকে দেখার অ্যাতো শখ ?

প্রশ্ন ও বলার ঢংয়ে পরিষ্কার, মানুষটি কৈলাসকে পরোয়া করে না। নিশ্চয় এর স্বতন্ত্র কোন পরিচয় আছে, যে পরিচয় কৈলাসকে পাত্তা দেয় না তবে কৈলাসকে আগলে রাখতে ব্যগ্র। কি সেই পরিচয় ?

দেখলাম খোলাখুলি কথা বলতে না পারলে এই মন্ত্রণাদাতার পাঁচিল টপকে কৈলাসের মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব। ভণিতা বাদ দিয়ে বললাম, সেদিন এখানকার আখবর 'দৈনিক জাগরণে' কৈলাসের নাম দেখলাম। ইনকম ট্যাক্সওয়ালারা ওর বাড়ি রেইড করে ছত্রিশ লাখ টাকা ও কয়েক কিলো সোনা-দানা পেয়েছে।

ঃ ঝুট্‌।—মন্ত্রণাদাতার পাঁচিল টপকে কৈলাস নিজেই গর্জে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথায় খুব কাছেই যেন পুজোর ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘড়ঘড়ে শ্লেষ্মাজড়িত গলায় কৈলাস বিড় বিড় করছে, এর জন্যই তো আমি আখবরওয়ালাদের সঙ্গে আর দেখা করি না। ওরা

খড় বাড়িয়ে মিথ্যে লেখে। অথচ বরিয়া বারিয়া আখবরওয়ালা আমার বন্ধু। আমার বাড়িতে, এই ঘরে বসে কত খানাপিনা করেছে। অথচ লেখার সময় যত উল্টোপাল্টা লিখে দিল।

ঃ তাহলে সাচ্ কোনটা কৈলাসবাবু? আপনার বাড়ি রেইড হয় নি?

ঃ হয়েছে।

লংকোট কৈলাসকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই কৈলাস বলে উঠল, আপনি থামুন। আমাকে বলতে দিন। উল্টা-সিধা যা লিখবার লিখবেন, আমি সাচ বাত বলব। আমার বাড়ি থেকে ছ' লাখ টাকা পেয়েছে। কোন সোনাদানা পায় নি। আর আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ত্রিশ লাখ টাকার হুণ্ডি পেয়েছে।

ঃ আপনার সেই বন্ধু কি আপনার বিজনেস পার্টনার?

ঃ তা কেন আপনাকে বলব?

ঠিক কথা। বিজনেসের গোপন কথা আমাকে কেন বলবে? তাই প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বললাম, শুনেছি আপনার ঘোড়া আগামী মঙ্গলবার সারনাথের ঘোড়দৌড়ে দৌড়বে। ওই ঘোড়ার জন্য রোজ দশ সের গরুর দুধ লাগে। তাই বলে গরু পুষছেন?

দমকা ঝোড়ো হাওয়ার মত প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ল কৈলাস। অলস চোখজোড়ায় কৌতুকের ছিটে। হাসি থামতে দাঁত দিয়ে একটা দিশি বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে বলল: শ্রীবাস্তবজীর চলে। আখবরবাবু, আপনার কী চলবে?

বলেই জিভ কাটল কৈলাস। ছিয়া ছিয়া। হামারই কসুর। আপনি তো বাঙালী বেরামভন।

মুখে ছিয়া ছিয়া বললেও লক্ষ্য করলুম, সত্যিকার কোন লজ্জা ওই মুখে নেই। পরমুহূর্তে বলে উঠল, ওই ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন? সামনের বারান্দায় রাম-সীতা-লছমনজীর মন্দির। বাঙালী বেরামভনই পূজা করছে। আমি পুজো টুজো বিশ্বাস করি না। বাবা করতেন।

তাই আমিও পুজো চালাচ্ছি। বন্ধ করে দিলে ওই পূজারী যে বেকার হয়ে যাবে।

খোঁচাটুকুতে কোন মাখনের প্রলেপ নেই। নির্মম ও স্পষ্ট। হজম করে বললাম, শ্রীবাস্তবজী জানেন আমি খাই। দিন এক পাত্তর।

মাটির খুরি এক টানে সাবাড় করে দিয়ে সোয়েটারের হাতায় ঠোঁট মুছতে মুছতে কৈলাস বলল, ছেলেবেলা থেকেই আমার ঘোড়ার শখ। রোজ সন্ধেবেলা ফিটনে চেপে বেড়াতে বেরোই। আমার ঘোড়া সারনাথের দৌড়ে দৌড়োয়। এবারও দৌড়বে। আমার দুটো ঘোড়া—বুদ্ধুরাম আর বাবু মঙ্গল সিং। তা ছাড়া গরু ও কুকুর যে আছে তা তো উঠোনে ঢুকতেই দেখেছেন। সামনের বারান্দায় মন্দিরের গায়ে চৌবাচ্চায় দুটো কুমির পুষেছি। আমার তিন ছেলে। চার মেয়ে। ছোট জগজিৎ আমার পেছনে ঘুমুচ্ছে। সেজ মেয়ে সরল আপনার পায়ের কাছে শুয়ে আছে।

আখবরবাবু যা খুশি তাই লিখুন। আপনি শ্রীবাস্তবজীর বন্ধু, তাই না করি নি। আমি ডোমের ব্যাটা ডোম। মড়া পোড়ানো আমার জাত ব্যবসা। তাই কাশীর সবাই আমাকে ভয় করে, আবার ঘেন্নাও করে।

ভয় করে, জানে—শেষ পর্যন্ত আমার কাছে আসতেই হবে। ঘেন্না করে, আমি সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে নীচু জাত বলে।

ভয়ের ব্যাপারটা বুঝলেও ঘেন্না কেন করে, স্পষ্ট হল না। একটু আগেই কৈলাস বলেছে, লোকাল নানা কাগজের সাংবাদিকরা ওর বন্ধু। বি. এইচ. ইউ-র অধ্যাপক ওর সঙ্গে পান করেছে। কই, কোথাও তো ঘেন্নার কোন লক্ষণ নেই। সে কথাই বললাম কৈলাসকে।

কৈলাস জবাব দিতে গিয়ে দেখলাম, হেসিটেট করছে। বোধহয় গুছিয়ে বলতে পারছে না। লংকোট ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে কোটের দুই সাইড-পকেটে হাত ঢুকিয়ে সামনে এগিয়ে এল: আমি বুঝিয়ে

দিচ্ছি। আমি নিজে চামার। জৌনপুরের এক্স-এম পি গণপৎরাম, অ্যাডভোকেট। ফিফটি-টু টু সিকসটি-সেভেন লোকসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলাম। আপনি বাঙালী, আমাদের ইউ পি'র জাত-পাতের ব্যাপারটা ঠিক বুঝবেন না।

কৈলাসের বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী আমার বন্ধু ছিলেন। চৌধুরীজীর খুব ইচ্ছা ছিল কৈলাস লেখাপড়া শিখুক। টাকার তো অভাব নেই। পড়াশোনা করে মানুষ হোক। তাই ওকে বেনারসের সেনট্রাল হিন্দু স্কুলে ভর্তিও করে দিয়েছিলেন।

: হামি বলছি চাচাজী। কৈলাসের ভারী গম্ভীর গলা গণপৎরামকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই সুতো টেনে চলল।

ক্লাস সিক্স-এর পর আর পড়তে পারলাম না। স্কুলে গেলেই আমার ক্লাসের বন্ধুরা, উঁচু ক্লাসের দাদারা, মাস্টারমশাইরা সারাক্ষণ বলত ডোম ডোম। কাছে গেলেই নাক সিঁটকে বলতো গায়ে নাকি মড়ার গন্ধ, মদের গন্ধ। কিসের নামে শপথ করব বলুন বাবু, তার নামে দিব্যি করে বলছি আমি তখন মদ খেতাম না। মদ খাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। শুধু তাই না, অন্য ছেলেরা আমার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসবে না। মাস্টারমশাইরা কথায় কথায় আমাকে মারতেন। না, হাত দিয়ে না। তাতে জাত যাবে। বেত দিয়ে। বড় মারতেন। কারণ ছাড়াই ক্লাসের বাইরে বার করে দিতেন। পরে বুঝেছি ক্লাসের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ওই ব্যবস্থা। পরে ক্লাসের সেই সব বন্ধু, স্কুলের সেই মাস্টারমশাইদের অনেকেই এই কৈলাসের কাছ থেকে গোপনে টাকা নিয়ে গিয়েছে। কৈলাসকে ছুঁলে জাত যায় কিন্তু কৈলাসের টাকার তো কোন জাত নেই। তবে ফেরৎ দিতে গেলে পাছে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় তাই কেউ ফেরৎ দেন না।

আর যারা ফেরৎ দেন না তারাই আমার ধন-দৌলতের কথা দশ-গুণ বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে সর্বত্র বলে বেড়ান। তাদের জন্যই আমার বাড়িতে রেইড হয়ে গেল। খোলাখুলি বলছি আমার আয়ের

পথ একটাই। আপনি তো মণিকর্ণিকায় গিয়েছিলেন। আমি কালু ডোমের বংশধর। কালু ডোমের দেওয়া আগুনেই রোহিতাশ্বের সৎকার হয়েছিল। সেই পবিত্র আগুন বংশপরম্পরা আমাদের হেফাজতে। আমরা মড়ার জন্য আগুন বেচি নেহাৎ বাঁচার তাগিদে। ওই আগুন ভেঙে আমরা খাই, সংসার চলে। তবে তারও একটা রেট আছে। অল্পবয়সী মড়ার জন্য পাঁচ আনা, বেশি বয়স হলে বিশ আনা। আর যদি কেউ খুশ হয়ে কিছু দেয়, ব্যস।

: কিন্তু চৌধুরীজী, আমি নিজের চোখে দেখেছি আগুন বেচে আটশ টাকা আদায় করতে।

: সে ওই ঘাটোয়ালদের কাজ।

: কিন্তু ঘাটোয়ালরা তো আপনারই লোক। ওরা যা আদায় করে তার অর্ধেক তো আপনার।

: হাঁ। তবে ওরা বড় গরীব। কেউ বছরে একদিন, কেউ বা দু দিন ঘাট পায়। ওরা কি আদায় করে তা জানি না। হিস্যা বলে ওরা যা দেয় তাই বিশ্বাস করে নিই।

: তা ঘাটোয়াল সবশুদ্ধ ক'জন?

: কাশীতে আমরা সবশুদ্ধ পৌনে দুশ ডোম। আমাদের বিয়ে-সাদি সব নিজেদের মধ্যে। অধিকাংশই খেতে পায় না। মুখ্যু সুখ্যু। আমিই ওদের খেতে দিই।

: লোকে বলে আপনার জন্যই নাকি কাশীতে মড়া পোড়ানোর ইলেকট্রিক চিতা বসছে না?

বুঝতে পারি নি এই প্রশ্নটা যে ইলেকট্রিক শক হয়ে উঠবে। কোলের বালিশটা ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল কৈলাস। এতক্ষণে পুরো চেহারাটা দেখতে পেলাম। ওপরে ফুলহাতা সোয়েটারের নীচে একখানা লাল গামছা। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই দুখানা পা। জ্যোৎস্না রাতে যেন খ্যাপা রয়েল বেঙ্গল ডেকে উঠল: ইলেকট্রিক চিতা বসলে আমরা খাব কি? সব টাকা

তখন নগর মহাপালিকা নিয়ে নেবে। তোমরা কি না খেয়ে মরবে?

এক্স-এম পি গণপৎরাম অ্যাডভোকেট, কৈলাসের কাঁধে বাঁ হাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, এতে চটছ কেন? উনি তো আর ইলেকট্রিক চিতা নিজে বসাচ্ছেন না। লোকে বলছে। আমিও তো তোমাকে সেই কথাই বলি। আজ না হোক কাল কাশীতেও আধুনিক ব্যবস্থা হবে। তার জন্য এখন থেকে তৈরি না হলে পরে করবেটা কী?

রক্তজবা চোখ দুটো জলে টল টল করছে। হাত দুটো কৈলাসের বুকের কাছে জড় করা। গলা যেন শ্লেষ্মায় বুজে এসেছে। বলল, ওই এক চিন্তায় আমার দিন রাত কখনো ঘুম হয় না। যদি ইলেকট্রিক চিতা বসে তবে আমার বাচ্চারা খাবে কী? আমার লোকরা যে না খেয়ে মরবে।

ঃ ছেলেদের কেন স্কুলে দিচ্ছেন না চৌধুরীজী?

ঃ দিয়েছিলাম বাবু। বড় রণজিৎ আর মেজ সঞ্জিৎ ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিল। স্কুলে বড় অপমান করে। রোজ বাড়িতে ফিরে বাচ্চারা কাঁদত। স্কুলে যেতে চাইত না। তাই ছাড়িয়ে দিয়েছি।

এই বেনারসেরই নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠী। সোসালিস্ট লিডার রাজনারায়ণ। সেই বেনারসে উনিশ শ আশি সালে ডোম বলে একটি ছেলে স্কুলে যেতে পারে না। অথচ বি এইচ ইউতে দেখেছি নেপাল থেকে বিতাড়িত রাজতন্ত্র-বিরোধী রাজনৈতিক নেতা জনৈক শিক্ষকের কোয়ারটারে রয়েছেন। যে শহরে এতটা রাজনৈতিক উদারতা সেই শহরে আজও কেন এত জাতপাতের বিরোধ?

ঃ আপনার ছেলেরা কি করছে চৌধুরীজী?

ঃ রঞ্জু, সঞ্জু দুজনেই ডোম। মণিকর্ণিকায় মড়া পোড়ায়। বড়র বয়স সতেরো, মেজ পনেরো।

বাপের বয়স পঁয়ত্রিশ। এদেশে বাল্য বিবাহই রেওয়াজ। সে

ব্যাপারে উচ্চ বর্ণ, নিম্ন বর্ণে কোন ভেদ নেই। ভেদ নেই টাকারও। যত ভেদাভেদ জন্ম নিয়ে। বিবেকানন্দের জন্মই বৃথা। আকাশে যখন উপগ্রহ পাঠাচ্ছি, তখন নিছক জন্মের জন্য সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পিতা অক্ষম।

উঠে দাঁড়ালাম। এবার যাব। লং কোটের পকেট থেকে উলের দস্তানা-ঢাকা হাত দুটো বার করে নমস্কার জানালেন গনপৎরাম। আমাদের পেছন পেছন কৈলাস দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

কৈলাস বলছে ঃ আপনাদের বাংলাদেশে তো জাতপাতের কোন বালাই নেই। দিন না আমার ছোট ছেলে জগজিৎটাকে ওখানকার একটা স্কুলে ঢুকিয়ে। টাকা যত লাগে দেব। তবু একটা ব্যাটা যদি লেখাপড়া করে মানুষ হয়।

আস্তে বললাম ঃ দেব।

নিশুতি রাত। জ্যোৎস্নায় পথ ঘাট ভেসে যাচ্ছে। এই আলো কাশীর তাবৎ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একই মায়ায় ছেয়ে আছে। তবু তো পার্থক্য ঘোচে না। ছান্দোগ উপনিষদেই আছে, একদা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ছিলেন শুধু ক্ষত্রিয়রাই। কাশীরাজ অজাতশত্রুর পায়ের তলায় বসে ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মবিদ্যার অক্ষর পরিচয় লাভ করেছিলেন। সেই কাশীতে আজ চণ্ডালরাজ ভয়ে নিজের পুত্রকে পারেন না ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈদ্য পরিচালিত স্কুলে পাঠাতে।

আমাকে হোলকার হাউসের সামনে নামিয়ে দিয়ে শ্রীবাস্তবজী ও ডঃ পটেকরকে নিয়ে টাঙা চলে গেল ওদের কোয়ার্টারের দিকে। বিশাল লোহার দরজার একটা পাল্লা খানিকটা ঠেলে লনে ঢুকলাম। একটা রাত-জাগা পাখি এই জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে গিয়েছে। ক্রমাগত গেয়ে চলেছে—টুহি, টুহি, টুই, টুই।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দেখি সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে।

ঃ এত রাতে তুমি ?

ঃ আজ একটা ঘটনা ঘটেছে।

ঃ কি ঘটনা ?

ঃ বসন্ত বাড়ি চলে গিয়েছে।

ঃ কেন ?

ঃ আজ বিকেলে ওর বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে ওর মার এখন তখন অবস্থা।

ওড়িশার একটা অখ্যাত ছোট ইংরাজি কাগজের রিপোরটার বসন্তকুমার দাস। বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। খাওয়া প্রায় জোটেই না। কটকের কাছে গাঁয়ে থাকে। এই কোরস অ্যাটেনড করার জন্য বন্ধুদের কাছ থেকে শুধু টাকা নয়, একটা গরম জামাও ধার করে এনেছে। এই প্রচণ্ড শীতে হাওয়াই শার্টের ভেতরে একটা হাফহাতা সোয়েটার পরে কাঁপতে কাঁপতে হাসি মুখে বলত ঃ দাদা, টু মাচ কোলড না ? রাতে পাশের ঘরে ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে আপন মনে নিজেরই লেখা ওড়িয়া, হিন্দি, ইংরাজি গান গাইত। একদিন শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে শুনি বসন্ত গেয়ে চলেছে। টুকরো টুকরো কয়েকটা শব্দ ঃ আগে বাঢ়ো, আগে বাঢ়ো, বাঢ়তে রহো নও জওয়ান।

বসন্তই বলেছিল, এই কোর্স করে ফিরে গেলে ওর একটু সুবিধা হতে পারে। বড় বড় কাগজ ও নিউজ এজেনসির মোটা মাইনের মনসবদারদের সঙ্গে ক্লাস করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, ও অনেক সময় আপন মনে কি যেন বিড়বিড় করত। ইংরাজি জানা ও উন্নাসিকতা এদেশে সফিসটিকেশনের চূড়ান্ত। ওড়িশার অতি দরিদ্র ঘরের ছেলেটি এই পরিবেশে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। তবু ভবিষ্যতের আশায় সব কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

ঃ এই খবরটা দেওয়ার জন্য এত রাতে এখানে অপেক্ষা করছিলে?

সন্ধ্যা চুপ করে দাঁড়িয়ে। মুখ নত। ওর চোখ দেখতে পাচ্ছি না।

ঃ কি হল? চুপ করে যে?

এবার মুখ তুলল। যেন ভীষণ ক্লান্ত। আমার চোখে চোখ রেখে বলল ঃ আজ আমিও বাড়ি থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।

ঃ ভেরি গুড। কেমন আছেন তোমার কর্তা? বাড়ির অন্য সব লোকজন?

ঃ ভাল।

ঃ ব্যস, শুধু ভাল? তোমার কথা ওরা জানতে চান নি?

ঃ সে তো আমার চিঠিতেই জেনেছে।

ঃ ওহ্, তাও তো বটে।

ঃ আজ সবার বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে। এক আপনার ছাড়া। তাই সবাই বলাবলি করছিল—।

ঃ কি বলছিল?

ঃ বলছিল।—বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

ঃ আরে থামলে কেন। বলই না শুনি কি বলছিল।

ঃ না-হ্, আমি বলতে পারব না। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম। শুনল না!

এবার কৌতূহল বেড়ে গেল। তাই জোর দিয়ে বললাম, দ্যাখ তো ওরা এই বলেছে কি না, আমি অ্যাত্ত বড় একটা স্কাউণ্ড্রেল যে বাড়ির লোকজন একটা চিঠি পাঠিয়েও খোঁজ নেয় না।

মুখ না তুলে মৃদু স্বরে সন্ধ্যা বলল ঃ কি করে জানলেন?

হেসে বললাম ঃ নিছক অনুমান। এ ক'দিনে প্রত্যেকের বাড়ি থেকে দু তিনটে চিঠি এসেছে। সকলেই বাড়িতে চিঠি লিখেছে। একা আমি ছাড়া। তাছাড়া আমি মদ খাই। কাউকে মানি না। নিজের খেয়াল খুশি মত ঘুরে বেড়াই। স্কাউণ্ড্রেলের মূর্তিমান ডেফিনিশন আমি। আর সবাই কেমন গুড বয়ের মত কোর্স অ্যাটেনড করছে বড় সাংবাদিক হবে বলে।

: আপনি কিছু খেয়েছেন ?

: হ্যাঁ।

: কী খেয়েছেন ?

: দিশী মদ, গোটা কয়েক গুলি আর একভাঁড় রাবড়ি।

: কেন এসব ছাইপাঁশ গেলেন বলুন তো ?

: তুমি কেন এত রাতে জেগে অপেক্ষা করছ ?

: ভয়ে।

এতক্ষণ খেয়াল করি নি। এবার তাকিয়ে দেখি ওর চোখ জুড়ে মমতা, শংকা সব নিবিড় হয়ে রয়েছে।

: ভয়ে ? আমার জন্যে ?

: হ্যাঁ। কাশী গুণ্ডা-বদমাইশের শহর। এ কথা ওদের কাউকে বললে ওরা বিশ্রী ইঙ্গিত করত, তাই না খেয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ডাইনিং টেবিলে আপনার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। তবে এত রাতে খাবেন না। যান শুয়ে পড়ুন।

আর কোন কথা না বলে সন্ধ্যা ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল। দোতলার ছাদে উঠে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে দেখি সমস্ত আকাশ ছেয়ে গাছের পাতায় পাতায় শিশির ঝরছে। বড় বিচিত্র এই শহর কাশী। কোথায় কার জন্য মমতা যে শিশির হয়ে ঝরছে কে জানে ?

॥ ছয় ॥

আরবানাইজেশন বা নগরায়ন কাকে বলে? পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী ও মহারাষ্ট্র আমি ঘুরেছি। দেখে শুনে মনে হয়েছে এ দেশটা যাঁরা চালান তাঁরা মনে করেন, এক জায়গায় কতগুলো কল-কারখানা, তার সঙ্গে অফিসারদের জন্য কিছু কোয়ার্টার, শ্রমিকদের জন্য বস্তি, গোটা কয়েক স্কুল, কলেজ আর হাসপাতাল বানিয়ে দিলেই নগরায়ন হয়ে যায়। তাঁদের মাথায় একটাই চিন্তা—কি করে কৃষির ওপর নির্ভরশীল কর্মহীন কোটি কোটি মানুষকে কয়েকটা কাঁচা টাকার লোভ দেখিয়ে শহরে টেনে আনা যায়। তা হলে কৃষির ওপর চাপ কমবে, ফলে উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে চাষীর হাতে ঘরের প্রয়োজন মেটানোর পরও থাকবে উদ্বৃত্ত ফসল। সেই বাড়তি ফসল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে কিনে নিয়ে শহরের চাহিদা যাবে মেটানো। ইনডাসট্রিয়ালাইজেশন তখন জোর কদমে এগোবে। কলকারখানায় তৈরি হবে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। কৃষি ও শিল্প পরস্পরের সাহায্যে ও সহযোগিতায় ফেঁপে ফুলে উঠবে। দেশ হবে সমৃদ্ধতর।

এদেশের শাসকদের সংহিতায় ইনডাসট্রিয়ালাইজেশন ও আরবানাইজেশন সমার্থক। নইলে কাশীর উপান্তে গত চৌত্রিশ বছরে যে সব কলকারখানা গড়ে উঠেছে তাতে না হয়েছে কাশীর নগরায়ন, না হয়েছে শিল্পায়ন। রেলের ডিজেল ইঞ্জিন বানানোর ফ্যাক্টরি কাশীর উপান্তে। এই ফ্যাক্টরিই পূর্ব উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম কারখানা। তিন যুগ হতে চললো বয়স। কিন্তু এত বয়সেও শিল্পায়নের বন্ধ দরজা পূর্ব উত্তর প্রদেশে খুলতে পারে নি এই

কারখানা। মাঝখান থেকে ওই এলাকার গ্রাম-ঝেঁটিয়ে যে মানুষগুলি কারখানার শ্রমিক চাহিদা মেটাতে এসেছে তাদের মনের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। নগর জীবন যে গ্রাম জীবন থেকে আলাদা, গ্রাম্য ও গ্রামীণ শব্দ দুটির যে অনেক পার্থক্য—এ ধারণাই তাদের নেই। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। একদিকে পুরোনো কাশী তার চার হাজার বছরের ধ্যান ধারণা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, অন্যদিকে সেই প্রাচীনকে অস্বীকার করে, তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় না রেখে পুরোনো কাশীর তিন দিকে গড়ে উঠছে সরকারী উদ্যোগে কল-কারখানা, নতুন উপনগরী, চওড়া রাস্তাঘাট, সরকারী কোয়ার্টার। ঠিক যেন কলকাতা। এখানে বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজারের বস্তিতুল্য নগর-জীবনের পাশেই প্রশস্ত খোলামেলা প্ল্যানড লেক টাউন ও সল্ট লেক। একে কি বৈচিত্র্য বলব? না, চিন্তার দুর্ভিক্ষ। অভাবের সমুদ্রের মধ্যে কি প্রাচুর্যের প্রবাল-দ্বীপ বানানো যায়? বানালেও কি তা টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব?

সম্ভব যে নয় তার জ্যান্ত প্রমাণ কাশী। দশ লাখের ওপর বাসিন্দা হলে শহরকে বলে মহানগর। কাশী আর দু-এক বছরের মধ্যেই মহানগর হবে। কিন্তু মহানাগরিক কোন চিহ্ন নেই চেহারায়। নিত্য নতুন লাকসারি সিনেমা হল গজাচ্ছে। প্রতিটি শো হাউসফুল। এখান থেকে সকালে তিনটি বিকেলে চারটি মোট সাতটি ডেইলি পেপার বেরোচ্ছে। কিন্তু কারো সারকুলেশন দশ হাজারের বেশি নয়। পুরোনো স্কুল কলেজগুলি বয়সের ভারে জরাজীর্ণ। তাদের সারানো বা সংস্কারের কোন চিন্তা ভাবনা নেই। শহরের নয়া রইসদের জন্য গড়ে উঠছে নিত্য নতুন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। তিন তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বি. এইচ. ইউ.-র পাশে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার কাশী বিদ্যাপীঠের চেহারা অনেকটা ঠিক কলকাতার মহাকালী পাঠশালার মত। গড়ে প্রতিদিন তিনজন খুন হয় শহরে। সিনেমার ব্ল্যাকার প্রতিটি সিনেমা

পাড়ায় কাশীর পুরোনো মস্তানদের দিন ফিরিয়ে এনেছে। রাস্তা উপচে জঞ্জাল, সরু ঘিঞ্জি রাজপথ, গলির কথা তো আগেই বলেছি। ট্রাফিক সমস্যা কলকাতার চেয়েও জটিল। তবু কলকাতা তার পুরোনো ঐতিহ্য জানে। রামমোহন টু প্রমোদ দাশগুপ্ত— ধারাবাহিকতার ফাঁক ফোকর সমেত। এখনো বিশ্ববিদ্যালয়, সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, যাত্রা, সাহিত্য কলকাতার জীবনে পরিবর্তন আনে। কলকাতা ভাবায়, উত্তেজিত করে। কাশীতে ক'জন খোঁজ রাখে গোপীনাথ পণ্ডিতের। ক'জন জানে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের কথা? এত বড় ইউনিভারসিটি বি, এইচ. ইউ. কাশীর জীবনে 'কতটুকু প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে?

ক্লাস করি না, নিজের খেয়াল খুশীমত ঘুরে বেড়াই। তাই নিয়ে নিত্য কথা। একদিন রুটিন মেপে সারাদিন ক্লাস করলাম। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা। ছাপানো রুটিন হাতের কাছে। তাতে লেখা আছে সকাল দশটায় প্রথম সেশন। বি. এইচ. ইউ-র অধ্যাপক মহাত্তিম সিং অতিথি বক্তা। সাড়ে এগারোটায় কফি-বিরতি। আবার পৌনে বারোটা থেকে একটা টানা বক্তৃতা। একটা থেকে দুটো লানচ ব্রেক। তারপর দুটো থেকে পাঁচটা অবধি সকালের পুনরাবৃত্তি।

ভারতীয় কৃষির গলদ, ভূমি-সংস্কারের অব্যবস্থা, কৃষির চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় সেচের জল-সংরক্ষণের ব্যাপারে অপদার্থতা, ড্রাইল্যাণ্ড ফারমিং নানা বিষয়ে অ্যাগ্রোলজির প্রফেসর মহাত্তিম সিং ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে জানতে চাইলাম, গোটা ইসটারন ইউ. পি. তো কৃষিতে অত্যন্ত অনুন্নত। দিল্লী কোটি কোটি টাকা কৃষির গবেষণা ও উন্নতির জন্য বি. এইচ. ইউ.-কে দিচ্ছে। তার কতটুকু চাষীর কাজে লাগছে?

প্রশ্ন করেই টের পেলাম প্রশ্নটি অধ্যাপকের আদৌ মনোমত নয়। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর চোস্ত ইংরাজিতে দেওয়া বক্তৃতার

তারিফ। অনর্গল স্ট্যাটিসটিক্স বলার দক্ষতার প্রশংসা। তার বদলে বেমক্কা এই প্রশ্ন। ঘাবড়ালেন না, সামলে নিয়ে বললেন, পর দিন সকালে আমাদের নিয়ে যাবেন কাশী থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে মিরজাপুর জেলায় জামগাঁওয়ে। সেখানে দিল্লীর টাকায়, বি. এইচ ইউ-র প্ল্যানে, গবেষকদের চিন্তাভাবনায় খরা-অধ্যুষিত ইসটারন ইউ পি-র একটি মডেল ফার্ম চলছে। তাই আমাদের দেখানো হবে।

পরের দিন রবিবার। সকাল আটটায় বি. এইচ. ইউ-র একটা ঢাউস বাস এল আমাদের নিতে। কোরস ডিরেক্টর, অধ্যাপক সিং ও আমরা সওয়ারী। দুপুর একটায় গিয়ে পৌছোলাম জামগাঁওয়ে। পিচ রাস্তা ছেড়ে গ্রামের ধুলো ওড়া রাস্তায় ঢুকতেই চোখে পড়ল দু'ধারে ক্ষেতে সামান্য কিছু সরষের চাষ চলছে। মাটির সব চালাঘর। দরজা, জানালাহীন। অনেকটা আমাদের পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার অজ পাড়াগাঁর মত। উলঙ্গ, কৃশ, কৃষ্ণকায় শিশুর দল বাস দেখেই হাততালি দিয়ে উঠল। কয়েকজন ধুলোর ঝড়ের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল বাসের পেছন পেছন। গাঁয়ের বয়স্করা সমীহ করে দূরে দাঁড়িয়ে। মিনিট খানেক ধুলো খাওয়ার পর হঠাৎ দেখি সামনেই এক বিশাল প্রাসাদ। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ছাড়া এই গাঁয়ে এই প্রাসাদ অসম্ভব। প্রাচীরের মাঝখানে বিশাল লোহার ফটক খোলা। বাস ওই ফটক পেরিয়ে সোজা চলল প্রাসাদের দিকে। ফটক পেরোতেই চোখে পড়ল বাঁ দিকে চমৎকার নীল জলের সুইমিং পুল। পুলের ধারেই সবুজ লন। লনের চারধারে গোলাপের যেন এগজিবিশন। বাস থামতেই চোখে পড়ল আটটা মোটর গাড়ি। প্রাসাদের সামনে পর পর দাঁড়িয়ে দুটি জীপ। একটা পুলিশের।

বাস থেকে নামতেই স্ট্রাইপড টেরিকটের ট্রাউজারস, বাফকালারের দামী সু ও লাল টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট পরা মধ্যবয়সী একটি মানুষ করজোড়ে এগিয়ে এলেন। ইনি মহারাজ

গৌরীশংকর। যৌবনে যুবরাজ ছিলেন। বাপ-পিতামহ ছিলেন এই তল্লাটের মহারাজা। সেই সুবাদে আজও এর জন-পরিচিত মহারাজা। মুখে বিনীত হাসি। কপালে ও দু'চোখের কোলে কালো কালো ছোপ। বোধহয় লিভারের ট্রাবল। দাঁতগুলো বিনয়ে ও পানের দাগে বিগলিত ও কলঙ্কিত।

লন ও সুইমিং পুলের ধারে ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে পর পর সোফাসেট সাজানো। সেন্টার টেবিলে সার সার কাচের গ্লাস। পাশে জলের জাগ। বরফের টাম্বলার। ভ্যাট সিক্সটিনাইনান, ওল্ড মংক ও নানান বিয়ারের বোতল দুটি ট্রলির ওপর সাজানো। সোফায় বসতে না বসতেই কোথা থেকে ছুটে এল জুতো বুরুশওয়ালা। বাধা দেওয়ার আগেই আমাদের পায়ের ধুলো ওদের বুরুশে উঠে গেল। লম্বা, বেঁটে, ছোট নানা সাইজের গ্লাসে মেরুন, ফিকে হলুদ, হলুদ জল নিয়ে এগিয়ে এল ধবধবে সাদা প্যান্ট ও ফুলহাতা বুশ কোট গায়ে বেয়ারার দল। সঙ্গে মাছ ভাজা, মাংস ভাজা। পাঁচ ঘণ্টার বাস জার্নির ক্লান্তি আগে দূর হোক, তারপর শুরু হবে মডেল ফার্ম দর্শন।

মহারাজা অত্যন্ত বিনয়ী। চমৎকার ইংরাজী বলেন। তাঁর আতিথ্য নাকি কেউ ঠেলতে পারে না। গত রাত্রে ফোনে অধ্যাপক সাহেবের কাছে খবর পেয়েই উনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও এস. পি-কে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরাও এসেছেন। সেই খোদ কাশী থেকে আলাদা প্রাইভেট কারে করে আনানো হয়েছে পূর্ব ইউ. পি-র সবচেয়ে বড় আকারের একজন রিপোর্টার ও একজন ফটোগ্রাফারকে। সর্বভারতীয় এই সাংবাদিক সম্মেলনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য।

আধ ঘণ্টা বাদে ডি. এম., এস. পি. ও মহারাজার সঙ্গে আমরা বেরোলাম ফার্ম দেখতে। ছ'টি প্রাইভেট কারে। সব কটি মহারাজার। কিছুটা গাড়িতে কিছুটা পায়ে হেঁটে ফার্মের সিকিভাগ দেখতেই বিকেল গড়িয়ে এল। অবিশ্বাস্য ফার্ম। ছশ বিঘা জমির

ওপর। কোথাও চলছে গমের চাষ, কোথাও সরষে, ছোলার। কোথাও শীতের সবজী ফুলকপি ও বাঁধাকপির। ফার্মের ঠিক মাঝখানে বিশাল দীঘিতে মাছের চাষ। চারদিকের ঘন সবুজের মাঝে এই নীল জল। এখান থেকে মোটা মোটা পলিথিনের পাইপ দিয়ে পাম্প করে জল মাঠে নিয়ে গিয়ে অগুন্তি স্প্রিংকলারের সাহায্যে উঠতি ফসলের ওপর ছড়ানো হচ্ছে।

ডি. এম. ও এস. পি. যদিও কৃষি-বিশেষজ্ঞ নন, তবু প্রাণপণে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন কি ভাবে মহারাজার একার চেষ্টায জামগাঁওয়ের মত অনুন্নত এলাকায় কৃষি বিপ্লব ঘটাচ্ছেন। মহেশ ও রমেশ খুব মন দিয়ে নোটবুকে টুকছে জমির পরিমাণ, ইলড পার একর, সারের ব্যবহার, সেচের ব্যবস্থা, পেস্টিসাইড ও ইনসেকটিসাইডের আয়োজন। অক্লান্ত মহারাজা না থেমে হাঁটতে হাঁটতে হাসিমুখে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছেন। বারবার একটা কথা বলছেন, আমার এই ফার্মের জন্য বি. এইচ. ইউ.-র কাছে ঋণী।

চারটে নাগাদ ফিরে এলাম আবার প্রাসাদে। লনের দু' দিকে সাদা চাদরে ঢাকা লম্বা টেবিলে ফিস, চিকেন, মটন, বিরিয়ানী, নিরামিষ পোলাও, পাঁজকারি, দহিবড়া, কচৌড়ি, ডাল, স্যালড, আইসক্রিম, ক্ষীরের সন্দেশ থরে থরে সাজানো। বুকে লানচ। ইউনিফরম পরা বেয়ারারা হাতে হাতে প্লেট, ন্যাপকিন, কাঁটা-চামচ তুলে দিচ্ছে। পাছে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাই গ্যাসের উনুনে মাছ, মাংস, বিরিয়ানী, পোলাও গরম হচ্ছে। হাতমুখ ধোয়ার ঠাণ্ডা জল, ধবধবে সাদা তোয়ালে নিয়ে বেয়ারারা প্রস্তুত। খাওয়ার আগে এক প্রস্থ পানীয় এল—খিদেয় শান দিয়ে নেওয়ার জন্য।

মহারাজাকে ঘিরে সাংবাদিকদের ভিড়। সন্ধ্যাও ওই ভিড়ে দাঁড়িয়ে খেতে খেতে শুনছে। কবে এই ফার্ম চালু হল? কি ভাবে? বি. এইচ. ইউ. কিভাবে কতটা সাহায্য করছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহারাজা সবিনয়ে বললেন, জমিটাই শুধু তাঁর। সেচ, সার, বীজ,

পেসটিসাইড, ইনসেকটিসাইড সব কিছু আসছে বি. এইচ. ইউ-র মডেল ফার্ম স্কীম থেকে। জমিদারী উঠে যাওয়ার পর মহারাজার অবস্থা যখন রীতিমত করুণ তখন দৈব আশীর্বাদের মত এল বি. এইচ. ইউ.-র এই দাক্ষিণ্য। বছরে তিনবার আজ এই ফার্মে ফসল উঠছে। এর জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করছে বি. এইচ. ইউ.। ফসল সবটাই মহারাজা ও এই ফার্ম কো-অপারেটিভের।

কো-অপারেটিভ? শব্দটা খট করে কানে লাগল। আস্তে পাশে গিয়ে জানতে চাইলাম, এই ফার্মের মালিক তাহলে কোঅপারেটিভ?

হেসে জবাব দিলেন মহারাজা: জী হাঁ। তাছাড়া তো ল্যাণ্ড সিলিং আইন অনুযায়ী ছ'শ বিঘা জমি রাখতে পারি না।

—কে কে এই সমবায়ের সদস্য?

—কেন আমি, আমার দুই ছেলে, স্ত্রী আর এই নৌকররা। —বলতে বলতে বাঁ হাতের প্লেটটা ধরে ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের ফাঁকে একটা মাছ ভাজা তুলে চারপাশে আমাদের সেবায় ব্যস্ত বেয়ারা, চাকর, বুরুশওয়ালা, দারোয়ানদের দেখালেন।

—গৌরীশংকরজী, শেয়ার কী ইক্যুয়াল?

কালো ছোপ ধরা তামাটে মুখের হাসিতে একটা বড় কাঁটার গায়ে মাখানো মাছের টুকরো টেনে দিয়ে মহারাজা বললেন: কাগজে-কলমে জরুর।

—ওরা যদি সত্যি সত্যি হিস্সা চায়?

অবিচলিত হাসির মধ্যে আর এক টুকরো মাছ গুঁজে দিয়ে গৌরীশংকরজী বললেন: আমার বাড়িতে তিনটে বুলডগ লোহার চেনে বাঁধা আছে। ওদের ছেড়ে দেব। আর আমার দুই ছেলে-ও আমি রেগুলার রাইফেল দিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করি। এখন পাখি মারি। তখন না হয় কয়েকটা মানুষ মারব।

অনেক খাদ্য, অনেক মদ্য, অনেক সৌজন্য সাবাড় করার পর বাসে

যখন উঠলাম তখন খেয়াল হল আমার পাশেই বসে সন্ধ্যা। পেছনের লম্বা সিটে অধ্যাপক মহাত্তিম সিং, রমেশ, মহেশ ও কোর্স ডিরেক্টর। আর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

আমেদাবাদের টাইমস অব ইনডিয়ার করেসপনডেন্ট হিসাবে রমেশ গুজরাটে কোথায় কোথায় এই ধরনের মডেল ফার্মিং দেখেছে তার বর্ণনা দিচ্ছিল। অধ্যাপক সিং হুঁ-হাঁ করছেন। মহেশ অন্ধ্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলছিল, গৌরীশংকরজীর মত ফার্ম যদি প্রতি জেলায় একটা করে করা যায় তাহলে গোটা দেশটার চেহারা অনিবার্যভাবে বদলাবেই। সেই সঙ্গে বার বার বলছিল, সারা দেশে যে কত ডেভলপমেনটাল অ্যাকটিভিটি চলছে তার কোন খবর সাংবাদিক হিসাবে সত্যিই আমরা রাখি না। কাগজ খুললেই রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ, দলীয় ঝগড়া, খুন-জখম-রাহাজানি-ধর্ষণের খবর। কিন্তু ইনডিয়ার মত আনডার-ডেভলপড ইকনমিতে ডেভলপড ওয়েসটারন কানট্রিগুলির কাগজের মত শুধু নেগেটিভ নিউজ ছাপলে দেশের লোকের মন বিষিয়ে যাবে। অ্যাডমিনিস্-ট্রেশনের ওপর আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। থেকে থেকে শুরু হবে নকশাল আন্দোলন। অনর্থক রক্তক্ষয়। মাঝখান থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ব। তাই আজ বড় দরকার পজিটিভ নিউজের। দেশের লোককে জানাতে হবে, এদেশেও অনেক কাজ হচ্ছে। লিখতে হবে গৌরীশংকরজীর মডেল ফার্মের কথা। বি এইচ ইউ-র সার্থক রিসার্চের কাহিনী দিল্লীর বদান্যতার উপাখ্যান।

আর পারলাম না। ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম: তিনটে বুলডগ, রাইফেল আর জাল সমবায়ের কথা লিখতে হবে না? লিখতে হবে না দিল্লীর টাকায় বি. এইচ. ইউ.-র গবেষণায় জামগাঁওয়ের এক প্রাক্তন মহারাজা আবার কী করে খাঁটি মহারাজা হয়ে উঠেছেন, তার কথা? গোটা গাঁয়ের সঙ্গে ওই মডেল ফার্মের কোন সম্পর্ক নেই, কোন দিন কোন সম্পর্ক গড়ে উঠবে না, উঠতে পারে না, সে কথা লেখা হবে

না? এ সব লিখলে কী নেগেটিভ নিউজ হবে? ডেভেলপমেনটাল জারনালিজম হবে না?

অত্যন্ত পরিশীলিত, সুভদ্র কোরস ডিরেক্টর আর থাকতে পারলেন না। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—উইল-ইউ প্লীজ স্টপ ইওর চাইলডিশ প্র্যাংকস?

ভদ্রলোক একদা একটি নামী ইংরাজি দৈনিকের বিশেষ সংবাদদাতা ছিলেন। দিল্লীবাসী। ওঁর ধারণায় ইংরাজি কাগজগুলিই কাগজ, দিশী কাগজগুলো রাবিশ। মজার ব্যাপার, অধিকাংশ বড় দিশী কাগজের মালিকের বদান্যতায় চলে ওঁর ইনসটিটিউট। তাদেরই টাকায় ম্যানিলা, হংকং, টোকিও, নিউইয়রক ঘুরে বেড়ান সারা বছর। আর কাগজমালিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য বছরে গোটা দুই এই ধরনের কোরস কনডাকট করেন। স্কচ হুইস্কি, পাকা রুই-এর গাদা, এয়ারকনডিশনড রুম, প্লেন ট্রাভল আর গ্রাহাম গ্রীন ওঁর পছন্দ। স্বচ্ছন্দ জীবনচচার পরিপন্থী সব কিছুই ওঁর না-পসন্দ। ব্যাপারগুলো জানি। তাই বললাম—সত্য কবে থেকে চাইলডিশ প্র্যাংকস হল?

—ননসেনস। —ভদ্রলোক যেন ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

বাসের ভেতরে অন্ধকার। একটা হাল্কা ঠাণ্ডা হাত নীরবে আমার ডান হাত চেপে ধরেছে। হু হু করে ইউ পি.-র পাহাড়ী রাস্তার ঢাল বেয়ে বাস নামছে। ঠাণ্ডা বাতাস গরম জামার বর্ম ছিঁড়ে চামড়ায় দাঁত বসাচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে আমি উষ্ণ।

মহেশের চোখ জোড়া যেন দু' টুকরো জ্বলন্ত কয়লা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—আমরা যার আতিথ্য নিয়েছি, তাঁকে আঘাত করা অসৌজন্য।

হেসে বললাম: ভারতীয় ভদ্রতার সঙ্গে আমি পরিচিত মহেশ। তবে সাংবাদিক হিসাবে ডেভলপমেন্ট জারনালিজমের যে নতুন সংজ্ঞা এই কোরস অ্যাটেনড করতে গিয়ে শিখছি তা বড় মজার।

মহেশ ক্ষেপে উঠল: নাথিং ফানি ইন ইট। ভাল কাজ ভাল

কাজ। খারাপ খারাপ। খারাপটা যদি লিখতে পারি, ভালটাই বা লিখব না কেন ?

জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, টের পেলাম সেই নরম হাত মিনতিতে শক্ত হয়ে উঠেছে আমার হাতে। কোন কথা না বলে ঘাড় ঘুরিয়ে নিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম পেছন থেকে কোরস ডিরেক্টরের গলা—আই উইল টক টু ইওর এডিটর।

হাসি পেল। জানি বয়স হলেও অনেকের নাবালকত্ব ঘোচে না। কারণ স্থিতাবস্থা নষ্ট হলে এদের সাজানো বাগান নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভয় এদের কুরে কুরে খায়। ওই ভয়ই এদের রক্তচক্ষু করে তোলে। এরা ভাবে, ভয় দেখিয়ে বুঝি সবাইকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়।

অনেক রাতে বাস যখন হোলকার হাউসের দরজায় এসে থামল, শুনলাম পরের দিন দিল্লী স্কুল অব ইকনমিকসের একজন ভারত-বিখ্যাত অধ্যাপক জনতত্ত্বের ওপর বক্তৃতা দেবেন। ঠিক করলাম, অনেক হয়েছে, আর নয়। কালই আমার অজানা কাশীর অসমাপ্ত পরিক্রমা ফের শুরু করব।

বাস থেকে নামতে নামতে অত্যন্ত মৃদু ভীরু গলায় সন্ধ্যা প্রশ্ন করল: কাল ক্লাসে আসছেন তো ?

বললাম: না। কাশী এখনো দেখা হয়ে ওঠে নি। তাই দেখতে বেরোবো।

—শুনলেন তো কোরস ডিরেক্টর কি বললেন ?

—শুনেছি।

—তার পরও ?

—তার পরও।

সন্ধ্যা, মহেশ ও রমেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভেতরে চলে গেল। আমি একা হোলকার হাউসের লনের নির্জন অর্জুন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই রাতজাগা পাখিটা আজ রাতেও মাথা খুঁড়ে মরছে—টুহি-টুহি, টুঁই-টুঁই।

॥ সাত ॥

দেখতে দেখতে আড়াই সপ্তাহ কেটে গেল। আর কয়েকটা দিন। তারপর আবার কলকাতায়। ঘুরে ঘুরে কাশী দেখছি। গঙ্গার ঘাট, শ্মশান, বিশ্ববিদ্যালয়, বাঈজী পাড়া, দুর্গাকুণ্ড রোডের বাঙালী বিধবা উদ্বাস্তুদের শিবির, জামগাঁওয়ে মহারাজার সামবায়িক ক্ষেতিবাড়ি, পুরোনো কাশীর গায়ে গজায়মান নতুন কাশী, রেলের ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা, স্থানীয় সংবাদপত্র অফিস, কোতোয়ালী, ডোমরাজা কৈলাস—দেখেছি। শুধু এখনো দেখি নি, যে জন্য সারা ভারত থেকে প্রতিদিন শয়ে শয়ে হিন্দু আসে এই কাশীতে, সেই বাবা বিশ্বনাথের মন্দির। সে কথা বলতেই শ্রীবাস্তবজী এক পায়ে খাড়া। বললেন, কবে যাবেন ?

—কবে নয়, আজই যাব।

আমাদের সঙ্গে লানচ করছিলেন সমাজবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীবাস্তবজী। হোলকার হাউসে আজকের লানচে বি. এইচ. ইউ.-র অনেক প্রফেসর এসেছেন। খেতে খেতে সাংবাদিকতা, রাজনীতি, বি. এইচ. ইউ.-তে আসন্ন বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন নিয়ে কথা হচ্ছিল। হাতঘড়ির দিকে চোখ রেখে শ্রীবাস্তবজী বললেন, এখন বাজে দেড়টা। তোমার ক্লাস শেষ হতে হতে তো সেই পাঁচটা।

প্লেটটা টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে বললাম, আমার ক্লাস আমি নিজেই ডিজলভ করে দিলাম। এখুনি বেরিয়ে পড়ব।

হাসতে হাসতে অধ্যাপক বললেন—গাঙ্গুলী, এত বছর পড়াচ্ছি, তোমার মত এমন একসপারট ক্লাস-কাটা ছাত্র দ্বিতীয়টি পাই নি।

ডান দিকে সোজা চলে গেছে দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তা গঙ্গা বরাবর। বাঁ দিকের সরু গলিতে ঢুকলাম আমরা। ছু' ধারে বেনারসী শাড়ির দোকান। পেতলের বাসন-কোসন ও গৃহসজ্জার দোকান একের পর এক। ঘড়িতে বাজে সোয়া ছটো। একটু আগেও শীতের রোদে কপালে, ঘাড়ে, গলায় ফাইন ঘাম হচ্ছিল। এখন এই গলির ভেতরে সব দোকানে হাই পাওয়ারের বালব জ্বলছে। ঠিক সেই মণিকর্ণিকার গলি। এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে চলেছে। তফাতের মধ্যে মণিকর্ণিকার গলি শ্মশানের দরজা, তাই বড ন্যাড়া। আর বিশ্বনাথের গলি দেবাদিদেবের পদপ্রান্তে গিয়ে মিশেছে—তাই আড়ম্বর, আয়োজন। অজস্র মিষ্টির দোকান। আমাদের অর্ঘ্য মানেই তো এক ঠোঙা মিষ্টি, কয়েকটা ফুল ও বেলপাতা।

মন্দির দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। ছোট বললে কিছুই বলা হয় না। এর চেয়ে কালীঘাটের কালী মন্দির সাইজে ঢের ঢের বড়। ছুপুর বেলা। ভিড় নেই। তাই আমাদের ছুজনকে দেখে পাণ্ডারা ছেঁকে ধরল। যত বলি পুজো দিতে আসি নি, দেখতে এসেছি, তবু ছাড়ে না। পাথরের এক এক মূর্তি দেখিয়ে বলে, প্রণাম কর, ভাল হবে। শেষে কুণ্ডে প্রোথিত লিঙ্গেশ্বর বাবা বিশ্বনাথের মাথায় হাত বুলিয়ে সেই হাত আমার মাথায় তুলতেই বাধা দিলাম। আর না, অনেক হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে, গলির শেষে এসে এক চায়ের দোকানে বসে ছু' কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম।

—কি ব্যাপার গাঙ্গুলী—অ্যাত চুপ করে আছ যে বড় ?

—বাবা বিশ্বনাথ বড় ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে।

—কেন, মন্দিরের সাইজ ছোট বলে ?—হেসে উঠলেন শ্রীবাস্তবজী। বললেন, তুমি যে মন্দিরটা দেখলে, এর বয়স বেশি নয়—মাত্র ২০৩ বছর। হোলকারের মহারানী অহল্যাবাঈ এটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। এর আগে যত বার এই মন্দির বানানো হয়েছে, ততবার মুসলিম

রাজারা ভেঙ্গে দিয়েছেন। এই মন্দির ও কাশীর সব মন্দির পাঠান রাজারা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ভাঙ্গার কারণটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। পরাজিত হিন্দুদের ঐহিক দিক থেকে দাবাতে সক্ষম হলেও পারত্রিক দিক থেকে তা তখনো সম্ভব হয় নি। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যই ধর্মের প্রতীক হিসাবে হাত পড়ল মন্দিরে। আর সব দেবতার মধ্যে প্রধান বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বনাথের ওপর আঘাত এল প্রচণ্ডতম ভাবে। শুধু ভেঙ্গেই ক্ষান্ত হলেন না, কড়া নজর রইল যাতে ওই মন্দির না পুনর্নির্মিত হয়। সেই সময়ে সুলতানা রাজিয়ার নির্দেশে বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভিতের ওপর গড়া হল মসজিদ।

কাশী স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূলে স্থাপিত। ত্রিশূলের এক ফলা মণিকর্ণিকা। অপর ফলা বিশ্বেশ্বরের মন্দির। আসলে এটি কাশীর আর একটি ঢিবি। কয়েক যুগ বাদে মুসলমান রাজারা যখন বেশ খানিকটা ভারতীয় হয়ে উঠেছেন, ধর্মদ্বেষ আর আগের মত নেই, তখন একে একে কাশীর সব মন্দির পুনর্নির্মাণ শুরু হল। মুশকিল হল বাবা বিশ্বনাথকে নিয়ে। ওঁর জায়গা দখল করে রয়েছে মসজিদ। ওই মসজিদে তো হাত পড়তে পারে না। আবার মূল জায়গা থেকেও বেশি দূরে নতুন মন্দির সরানো চলবে না। তখন অনেক ভেবে চিন্তে পাশেই অভিমুক্তেশ্বরের মন্দিরের চত্বরের এক কোণে তৈরী হল বিশ্বনাথের নতুন মন্দির। উত্তরে অভিমুক্তেশ্বরের মন্দির, দক্ষিণে জ্ঞান বাপী—মাঝে রইলেন বিশ্বেশ্বর।

কিন্তু আবার কাশীর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। সব মন্দির ধুলোয় মিলিয়ে গেল। ঝড় কেটে যেতে, সুস্থ ধর্মবোধ ফিরে আসতে আবার যখন সব মন্দির নতুন করে বানানো হল তখন অভিমুক্তেশ্বরের মন্দিরের ভিতে গড়ে উঠল বাবা বিশ্বনাথের মন্দির। আর অভিমুক্তেশ্বর ওই মন্দিরের এক কোণে একটি ছোট মন্দিরে পেলেন ঠাঁই। অভিমুক্তেশ্বরের পূর্ব গৌরব ম্লান হয়ে বিশ্বেশ্বরের গৌরব পেল

বৃদ্ধি। ১৪৯৪ এবং ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দিল্লীর সুলতান সিকন্দার লোদী আবার সব মন্দির দিলেন ভেঙ্গে। পুনর্নির্মাণ পর্বে অভিমুক্তেশ্বর সব গৌরব হারিয়ে বিশ্বেশ্বরে লীন হয়ে গেলেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব আবার মন্দির ধ্বংসে নামলেন। সব মন্দির হল চূর্ণ। শুধু বিশ্বেশ্বরের আধখানা বাকি রেখে বাকি আধখানায় বানানো হল একটি মসজিদ।

আওরঙ্গজেবের আমলেই জ্ঞানবাপীর দক্ষিণে এক কোণে আশ্রয় পেলেন বিশ্বনাথ। প্রায় নীরবে, মন্দির ছাড়াই, চলল তাঁর পূজা। পাছে মন্দির বসালে মুঘল সম্রাট চটে যান। অবিশ্যি কাশীর মুঘল শাসকরা বিশ্বনাথের এই অস্তিত্বের কথা জানতেন। তারপর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী অহল্যাবাঈ দেবাদিদেবকে তাঁর দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য বানিয়ে দিলেন বর্তমানের এই মন্দির। তাই এই মন্দির ওই দেবস্থানের মধ্যবর্তীও নয়, আকৃতিতেও নয় বিশাল। দেবতাই শুধু সম্বল।

মহারানী অহল্যাবাঈ যেমন বিশ্বনাথের মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছেন, তেমনি বাংলাদেশের রানী ভবানীর অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছে ওঙ্কারেশ্বর শিবের মন্দির। কপালমোচন সরোবরের পাড়ে পাথর দিয়ে বাঁধানোর সঙ্গে সঙ্গে এই পরম জাগ্রত দেবতার মন্দির রানী ভবানী বানান অষ্টাদশ শতাব্দীতে। পরে ওই মন্দিরসহ চত্বরে গড়ে ওঠে একটি মুসলিম গোরস্থান। চলতি শতাব্দীর গোড়ায় অনেক মামলা মোকদ্দমার পর পুরোনো মন্দিরটি নতুন করে বানানো সম্ভব হয়।

গঙ্গার পাড়ে কেদারঘাটের ওপরেই কেদারেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরের অন্তঃগৃহে যাঁর মৃত্যু হয়, তাঁকে আর ভৈরবী যাতনা ভোগ করতে হয় না—অবধারিত মোক্ষলাভ তাঁর ঘটেই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিমদের নজর এড়িয়ে কালেশ্বর শিবের মন্দির পুনর্নির্মাণ কালে কালেশ্বর পরিণত হন বৃদ্ধ কালেশ্বরে। কারণ

ততদিনে কালেশ্বরের জন্য আর একটি মন্দির অন্যত্র গড়ে ওঠে। কীর্তিবাসেশ্বর শিবের মন্দিরই প্রথম কাশীর মন্দির, যা আওরঙ্গজেব সর্বপ্রথম ধ্বংস করেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দির ধ্বংসেরও দশ বছর আগে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ওই মন্দির পুনর্নির্মাণের আর কোন চেষ্টাই হয় নি। পুরোনো মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি মজা পুকুরে হিন্দুরা কীর্তিবিশ্বাসের নামে শতাব্দীর পর শতাব্দী পুজো দিয়ে আসছে। এ ছাড়া বীরেশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর, বৃষভর্ধন, কামেশ্বর, ধর্মেশ্বর, মধ্যমেশ্বর কাশীর অগুন্তি শৈবধর্মের মধ্যে বহুপুজিত কযেকটি মন্দির।

শৈব পূজার যেমন পীঠস্থান কাশী, তেমনি বৈষ্ণবদেরও প্রধান তীর্থ এই কাশী। বিষ্ণুই কাশীর প্রধান উপাস্য দেবতা। আওরঙ্গজেব ধ্বংস করার আগে খোদ বিশ্বেশ্বরের মুক্তি মণ্ডপে ছিল বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। বিষ্ণুর পূজা না দিয়ে বিশ্বেশ্বরের পূজা ছিল নিষিদ্ধ। আজও আদি-কেশব, বিন্দুমাধব, নৃসিংহ, বামন এবং বরাহ মন্দিরে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতাররূপের পূজার্চনা চলেছে। আজকের অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্তি ও মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীর নির্মিত।

নয় চণ্ডী, নয় দুর্গা ও নয় শক্তি—তিন ন'যে সাতাশ সমেত কাশীতে আজ বাহাত্তরটি দেবী মন্দির। মাতৃকা মূর্তিদের মধ্যে সংকটাঘাটের কাছে সংকটা দেবীর মূর্তি কাশীতে বর্তমানে সর্বাধিক পূজিত। আর দশাশ্বমেধ ঘাটের শীতলার অষ্টমূর্তি কাশীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

কৃত্যকল্পতরু মতে নয় এবং কাশীখণ্ড মতে একাত্তর—সবসুদ্ধ আশীটি বিনায়ক মন্দির ছিল প্রাচীন কাশীতে। সব বিনায়কের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধুন্ধি-বিনায়ক। লোকের মুখে মুখে যা ধুন্ধি-রাজ। গণেশ পূজা অতীতে জনপ্রিয় হলেও গত কয়েক শতাব্দীতে গণেশ বা বিনায়কের পূজা কাশীতে খুবই সীমিত হয়ে এসেছে।

কাশীখণ্ডে কার্তিক বা স্কন্দদেবের তিন মূর্তির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম মূর্তিটি ছিল মণিকর্ণিকা ঘাটে—আজ আর যার চিহ্নও

নেই। দ্বিতীয় কার্তিক মূর্তি ছিল রত্নেশ্বর মন্দিরের কাছে অম্বিকেশ্বর মন্দিরে। শিবলিঙ্গাকৃতি এই মূর্তির ছিল ছয় মুণ্ড। নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এই মূর্তিটি এখন রয়েছে কালভৈরবের মন্দিরে। তৃতীয় মূর্তিটি ছিল স্কন্দেশ্বর কার্তিকের নিজ মন্দিরে। মন্দিরটি আর নেই, গুপ্ত যুগে নির্মিত ওই অপরূপ স্কন্দমূর্তিটি বি. এইচ. ইউ-র ভারত কলাভবনের গ্যালারিতে রয়েছে।

কালভৈরবের মন্দিরই সম্ভবত প্রাচীন কাশীর অর্বাচীনতম মন্দির। বারাণসীর একই ভৈরব—কালভৈরব। ধর্মক্ষেত্র কাশীকে বাইরের পাপীদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং নগরীর পাপীদের শাস্তি দিয়ে পবিত্রতা বজায় রাখাই তাঁর কাজ। পুলিসী দায়ভাগের জন্য সাধারণে কালভৈরব কাশীর কোতোয়াল বলে পরিচিত। পাধানী টোলায় ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরেই ছিল কালভৈরবের আদি আশ্রম। কিন্তু পরবর্তীকালে বার বার ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণ কালে কালভৈরব ভক্তরা তাঁর জন্য কোন বিশাল মন্দির বানান নি। ছশ বছর তাঁর আশ্রয়ে ছিল একটি চালাঘর। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়াদের সৈন্যাধ্যক্ষ সর্দার বিনচুরকর বর্তমান মন্দিরটি বানিয়ে দেন।

প্রাচীন কাশীতে ছিল ত্রয়োদশ সূর্যমন্দির। কাল একে একে দশটি হরণ করলেও সূর্যের অমলিন জ্যোতি তিনটি মন্দিরে আজো ভাস্বর। ভাদইনির লোলার্ক সূর্যকুণ্ড মহল্লার শাম্বাদিত্য এবং মঙ্গলা-গৌরী মন্দিরের ময়ূখাদিত্য, এই তিন ভাস্বর-সূর্য।

কাশীখণ্ডে তিন নাগতীর্থের উল্লেখ আছে—কার্কোতক, মণিপ্রদীপ ও ভদ্রনাগ। আজও নাগপঞ্চমীর দিন কাশীর নাগ কুঁয়ায় কার্কোতকের মূর্তি পূজা হয়। পুরাণ মতে বৈয়াকরণিক পাতঞ্জলি এই নাগ কুঁয়ায় থাকার সময় মহাভাষ্য রচনা করেন। অতীতে প্রতি বছর নাগপঞ্চমীর দিন এখানে শাস্ত্রালোচনা হত। হাজার বছর ধরে ভারতবিখ্যাত সব পণ্ডিত এখানে এসেছেন ওই শাস্ত্রালোচনার জন্য।

শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক পাতঞ্জলি

জীবনের শেষ কটি বছর বারাণসীতে কাটান। এখানে থাকার সময়ই তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে শিখিয়ে দেন তাঁর মহাভাষ্য। জন-বিশ্বাস পাতঞ্জলির নশ্বর দেহ দেবাদিদেব বিশ্বনাথে লীন হয়ে যায়।

ভক্ত কবীরও বারাণসীর বাসিন্দা ছিলেন। বারাণসীতে জীবনের বড় অংশ কাটলেও কবীর চাননি যে তাঁর মোক্ষলাভ হোক বারাণসীতে। তাঁর দোঁহাতেই সে কথা তিনি বলে গিয়েছেন: "যদি বারাণসীতেই কবীরের মৃত্যু হয় (আর তার ফলেই হয় মোক্ষ লাভ) তাহলে সেই মৃত্যুকে কেন রামের কৃপা মনে করে ধন্য হব।" আত্মপ্রত্যয়ী পরম ঈশ্বর ভক্ত কবীর শেষ জীবনে কাশী ছেড়ে বস্তি জেলার এক অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রাম মাগাহারে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দু, মুসলমান উভয় পক্ষই তাঁকে স্ব-ধর্মী বলে দাবি করে বসল। অপেক্ষাকৃত বলশালী, রাজশক্তির সাহায্যে শক্তিশালী মুসলিমরা তাঁকে কবর দিলেন। কিন্তু পরে তাঁর কবরের মাটি খুঁজে দেখা গেল, সেখানে পড়ে আছে শুধু একমুঠো ফুল। ওই ফুল দুই পক্ষ ভাগাভাগি করে নিল। মুসলমানরা ওই ফুল গোরে দিয়ে তার ওপর বানাল স্তম্ভ। হিন্দুরা দিল সমাধি। আজও মাগাহারে মুসলমানের স্তম্ভ ও হিন্দুর সমাধি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে অবিনাশী কবীরের মানবপ্রেমের চিহ্ন হিসাবে।

এই সেদিন ১৬২৩ সালে সারাদেশ "রামচরিত মানস" কাব্যের চারশো বার্ষিকী পালন করল। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রাবণী কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয় দিবসে ওই কাব্যের স্রষ্টা তুলসীদাসের মৃত্যু হয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল শ্রাবণী শুক্ল পক্ষের সপ্তম দিবসে। রামভক্ত মহাকবি তুলসীদাস বারাণসীরই মানুষ।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহাসাধক কিনারাম কাশীর কৃমিকুণ্ডে এক তেঁতুল গাছের নীচে তাঁর আশ্রম বানান। অবধূত মার্গের এই সাধক দিব্যদৃষ্টিতে স্বয়ং গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তাঁর মতে ঈশ্বর সর্বজীবে, সর্ববস্তুতে বিদ্যমান—ফলে ঈশ্বরের পৃথিবীতে

কিছুই বর্জনীয় হতে পারে না। লোকে বলে, এই মহাসাধক দেড়শো বছর জীবিত ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের আমলে বারাণসীর দুই মহাযোগীর যোগসাধনায় স্বয়ং মুঘল সম্রাট বিস্মিত হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। প্রথম জন অপরানাথের যোগলীলায় মুগ্ধ হয়ে আওরঙ্গজেব তাঁকে তিন খণ্ড জমি দান করেন। ধুন্ধিরাজ, লক্ষ্মীকুণ্ড ও ময়দাগিনে অপরানাথের শিষ্যরা যে তিনটি মঠ বানিয়েছিলেন তা আজও ভালভাবেই চলছে।

দ্বিতীয়জন যোগীরাজ জঙ্গম স্বামী। তাঁর নামেই কাশীর জঙ্গম বাড়ি। স্বামীজীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে সনদ ও সম্পত্তি অর্ঘ্য দেন।

মহাযোগী সিদ্ধগিরিও কাশীর ললিতাঘাটে এক মঠ বানান। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের অনেকেই যোগসাধনায় সিদ্ধ লাভ করেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ শিক্ষক তোতাপুরী গত শতাব্দীতে এই কাশীরই ভেলুপুরে থাকতেন। রামকৃষ্ণকে যোগ সাধনায় শিক্ষিত করার জন্যই তিনি কাশী থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন।

আজও কাশী যে মানুষটির কথায় মুখর, সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী এখানে এই গঙ্গায় বিশ্বসানে লীন হয়েছিলেন ঠিক একশ বছর আগে—১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পিতৃদত্ত নাম শিব রাম। জন্ম ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে (১৬৬৪ সম্বত) পৌষ মাসের শুক্লা একাদশীতে দাক্ষিণাত্যের তেলেঙ্গানায় বিজয়নগর রাজ্যের হালিয়া গ্রামে। জনশ্রুতি—জন্মলগ্নে মাতৃ ক্রোড়চ্যুতির জন্য এই শিশু কাঁদে নি। যত দিন যেতে লাগল তত তাঁর ধর্মীয় অনুরাগ বাড়তে লাগল। বাবা মা ভয় পেয়ে শৈশবেই বালকের বিয়ে দিতে চাইলেন। বালক শিব রাম নারাজ। নিরুপায় অভিভাবক চুপ করে রইলেন। বালক শিব রাম কৈশোরে পা দিতে না দিতেই পিতা নরসিংহ রাওকে হারালেন। এর পর থেকে শিব রাম অস্বাভাবিক রকম নীরব হয়ে গেলেন—কারো সঙ্গে কথা প্রায় বলতেনই না। ধর্মীয় জীবনে মা-ই হয়ে উঠলেন তাঁর ঈশ্বরী। কিন্তু

সেই ঈশ্বরীও হারালেন কৈশোরে। তখন ঘরে ছিলেন না শিব রাম। ফিরে এসে দেখলেন আত্মীয় -স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী মায়ের দেহ নিয়ে চলেছেন শ্মশানের পথে। স্তব্ধ-বাক শিব রাম তাদের অনুগামী হলেন। মুখাগ্নি করলেন, চিতা জ্বলে উঠল। ভস্মে পরিণত হল ঈশ্বরীদেহ। চিতাভস্ম সর্বাঙ্গে মেখে ধ্যানস্থ হলেন কিশোর শিব রাম। উদ্বিগ্ন আত্মীয়-স্বজন তাঁর ধ্যান ভাঙ্গাতে তিনি তাদের বললেন, ঘরে আর ফিরবেন না, এখন থেকে শ্মশানই তাঁর ঘর। এই ভাবে কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। একটি দুটি নয়। তখন তাঁর বয়স আটাত্তর, এমন সময় এক নিশুতি রাতে স্বামী ভগীরথানন্দ এসে দাঁড়ালেন শিব রামের সামনে। বললেন, সাধনার প্রথম পর্যায়ে সিদ্ধ লাভ করেছেন শিব রাম। এবার তাঁকে উঠতে হবে। ঘুরতে হবে তীর্থে তীর্থে।

ভগীরথানন্দজীর হাত ধরে শ্মশান-ঠিকানা ছেড়ে তেলেঙ্গী স্বামী শিব রাম নামলেন পথে। চললেন রাজস্থানের আজমীরের কাছে পুষ্কর তীর্থে। পুষ্করেই নিলেন সন্ন্যাস দীক্ষা। দীক্ষান্তে তেলেঙ্গী শিব রাম হলেন গজানন সরস্বতী, সংক্ষেপে গনপতি স্বামী। এখানেই গুরুর কাছে পেলেন যোগ শিক্ষা। গভীর অনুশীলনে হয়ে উঠলেন মহাযোগী। কিছুদিন বাদে গুরুর মৃত্যু হলে দণ্ড কমণ্ডলু ছেড়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, কখনো কারো কাছে কিছু চাইবেন না বা কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। মহাসাধক কিনারামের মত তিনিও অবধূত হয়ে তীর্থ পরিক্রমায় বেরোলেন। সম্পূর্ণ নিরাবরণ, পুরোপুরি উলঙ্গ এই তেলেঙ্গী স্বামী তীর্থে তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে হাজির হলেন ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তস্থিত মহাতীর্থ রামেশ্বরমে। তখন তাঁর বয়স নব্বই। প্রতিজ্ঞা করেছেন মুখে কিছু গুঁজে না দিলে, নিজে থেকে কোন খাদ্য আর গ্রহণ করবেন না।

রামেশ্বর ছেড়ে এই মৌনী মহাযোগী পায়ে হেঁটে চললেন গুজরাটে দ্বারকায়। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে গোটা উত্তর ভারত

পায়ে মাড়িয়ে একদিন হাজির হলেন নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরে। ছ বছর ছিলেন ওই মন্দিরে। লোকমুখে মৌনীবাবার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখানা তখন দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। পশুপতি-নাথ নয়, তাঁরই সেবক এই মৌনী সাধকের চরণদর্শন আশে হাজার পুণ্যলোভী নিত্যদিন ছুটে আসছে। উত্যক্ত হয়ে উঠলেন স্বামীজী। একদিন কাউকে কিছু না বলে মন্দির ছেড়ে পশুপতিনাথের নিজস্ব আলোয হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়লেন। বদ্রীনাথ, কেদারনাথের দর্শন সেরে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথে কৈলাস ও মানস সরোবর গেলেন। বহু বছর মানস সরোবরের পারে কৈলাসের গুহায় ধ্যান করেছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পনেরো থেকে বাইশ হাজার ফুট উঁচু, হিমশীতল পরিবেশে বহিরঙ্গে পূর্ণ নির্মোক এই মহামানুষ অন্তরাত্মার সাক্ষাতের উষ্ণতায় বিভোর হয়ে থাকতেন। বেশ কয়েক বছর এই ভাবে কেটে গেল। বছরের সময় তো নশ্বর মানুষের। যিনি নশ্বরতাকেই জয় করেছেন সময় তো তাঁর সেবক, তাঁর প্রহরী। সময় তো ফেরে তাঁরই চরণ ঘিরে ঘিরে। চরণাশ্রিত কাল একদিন তাঁরই অনুসরণে হিমালয় ছেড়ে ফিরে এল সমতলে—মৌনীস্বামী এলেন মধ্যপ্রদেশে। নর্মদার তীরে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে অবশেষে এলেন গঙ্গার তীরে বারাণসীধামে। গোড়ায় কিছুদিন অসসী ঘাটে ছিলেন। তার পর ঠিকানা বদলে চলে এলেন পঞ্চগঙ্গায়। কত অনাথ আতুর, এমন কী মৃতও জীবন ফিরে পেয়েছে তেলেঙ্গানার এই মহাযোগীর করুণায়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের এই তেলেঙ্গী বা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে একবার চোখের দেখা দেখতে কালী কলকাত্তাওয়ালীর সেবক পরম সাধক রামকৃষ্ণ ছুটে এলেন কাশীতে। পরবর্তী কালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরু তিনি এলেন গুরুর গুরু পরম গুরুকে দেখতে। রামকৃষ্ণ উঠলেন কেদার ঘাটে। নৌকো করে পঞ্চগঙ্গায় স্বয়ং শিবশম্ভুকে দর্শন অভিলাষে যাওয়ার পথে মনিকর্ণিকা মহা-

শ্মশানের কাছে আসতেই হল তাঁর সমাধি। দিব্যচক্ষে দেখলেন শিব পার্বতীকে। পার্বতী স্বহস্তে শঙ্খে অমৃত ঢালছেন, শিব সেই অমৃত-পূরিত শঙ্খ শবদেহের দক্ষিণ কর্ণে উজাড় করে দিতে দিতে উচ্চারণ করছেন তারক মন্ত্র। খানিকবাদেই নৌকো এসে ভিড়ল ব্রহ্মঘাটে। দুরন্ত গরমের দিন। নদীর পাড়ে বালি চিড়বিড় করে ফুটছে, পা ফেলা দায়। দেখলেন সেই তপ্ত বালুকাবেলায় সূর্যমুখী হয়ে পরম প্রসন্নতায় শুয়ে আছেন যোগীশ্বর ত্রৈলঙ্গনাথ। দুই মহাসাধক হলেন মুখোমুখি। কারো মুখে বাক্য সরে না। দু চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে চুপচাপ পরস্পরকে ছুঁয়ে বসে রইলেন দুজন। নবীন কলকাতা সেদিন, সেই মুহূর্তে প্রবীন কাশীর কাছ থেকে কোন্ মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তার বৃত্তান্ত আজ আর কারো জানা নেই, শুধু পরমহংসদেব কেদারঘাটে ফিরে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, ওরে.যাকে দেখে এলাম, যাকে ছুঁয়ে এলাম সে ত্রৈলঙ্গস্বামী নয় রে—স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ। কাশীবাসীদের কাছে সত্যিই তিনি তখন দেবাদিদেব বিশ্বনাথ।

কলকাতায় তখন ঘোর বৃটিশ রাজত্ব। ভিকটোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী। কলকাতা ভারতের রাজধানী। সেই সময়, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ। সেই সময় একদিন ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁর ভক্তদের ডেকে বললেন, আর মাত্র চারটি বছর তিনি আছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের (১৯৩৮ সম্বত) পৌষ মাসের শুক্লা একাদশীতে তিনি বিদায় নেবেন। মহাবিদায়ের দু তিন ঘণ্টা আগে ভূগর্ভ প্রকোষ্ঠে শেষবারের মত ধ্যানমগ্ন হলেন মহাযোগী। যখন বেরিয়ে এলেন এক মহাজ্যোতির্বলয়ে দিব্যদেহ উদ্ভাসিত। চললেন গঙ্গার ঘাটে। পেছনে হাজার হাজার ভক্ত, অনুগামী ও অলৌকিক-কৌতূহলীর মিছিল। তাঁরই নির্দেশে নির্মিত এক পাথরের বাক্সে তিনি প্রবেশ করলেন। পূর্ব নির্দেশমত বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়া হল। নৌকোয় তোলা হল বাক্সটি। মহাযোগীর শেষ আদেশ অনুযায়ী মাঝ গঙ্গায় ওই বাক্স সমেত তাঁকে

জলাঞ্জলি দেওয়া হবে। এই সময় কলকাতা থেকে একদল ভক্ত এসে হাজির। মহাপ্রয়াণের আগে শেষবারের মত তাঁর দর্শন তারা চান। অনুনয় বিনয়ে পাথরও গলে। এ ক্ষেত্রে বন্ধ ঢাকনা খোলা হল। কিন্তু কোথায় সেই মহাযোগী? কোথায় বারাণসীর দেহধারী বিগ্রহ দেবাদিদেব বিশ্বনাথ? বহু নীচে পাথরের বাক্সের মেঝেয় পড়ে আছে একরাশ ফুল। তিনি নেই।

বিসর্জন আর দেওয়া হল না। ভক্তজন সেই বাক্স টেনে নিয়ে চললেন সেই সাধন ক্ষেত্রে, যেখানে ভূগর্ভ প্রকোষ্ঠে বসে ত্রৈলঙ্গ স্বামী ধ্যান নিমগ্ন হতেন। ফুল ভরা বাক্স সেই প্রকোষ্ঠে রাখা হল। ওপরে স্থাপিত হল এক বিশাল শিবলিঙ্গ। আর প্রতিদিন যেখানে বসতেন সেখানে বসানো হল এক পূর্ণবয়াব মূর্তি—ত্রৈলঙ্গ স্বামীর

ত্রৈলঙ্গ স্বামী ১৭৪ বছর জীবিত ছিলেন শুনে যারা অবিশ্বাসে নাক কুচকোন, ছোটে পরমহংস ৩০০ বছর বা তাঁর গুরু আরো বেশি বছর জীবিত ছিলেন, এ কথা শুনলে তারা কী করবেন?

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জন্ম বৃত্তান্ত, জন্ম সময়, পিতামাতার নাম ও ঠিকানা জানা গেলেও ছোটে পরমহংসদেবের কিছুই জানা যায়নি। শুধু জানা যায় বলরামপুরের মহারাজা স্যার দিগ্বিজয় সিং-এর পরিবারে পাঁচ পুরুষ ধরে প্রতি বছর বিজয়াদশমীর দিন তিনি আসতেন। প্রথম যে বার আসেন তখনই তাঁর বয়স দেড়শো বছর। পরবর্তী দেড়শো বছর তাঁর চেহারা ও স্বাস্থ্য ছিল একই রকম। কখনো কোন অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখান নি। ছিলেন যোগী, পরমহংস। খেতেন খুবই সামান্য। যা খেতেন, খাওয়ার দু এক ঘণ্টা বাদে তাও উগরে দিতেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন বোম্বাই-এর বিখ্যাত ডাক্তার স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ ভাটভাদেকর। ডাক্তার ভাটভাদেকরের ক্লিনিকেই তিনি মারা যান।

ডাঃ ভাটভাদেকর লিখছেন, একদিন সকালে বোম্বাই-এ নিজের

ক্লিনিকের সারজারি রুমে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সামনে দাঁড়িয়ে ছোটে পরমহংসদেব। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে বললেন, একটা জরুরি কাজে এসেছেন, মৃত্যুর আগে 'উইল' করে দিয়ে যাবেন। আমি হেসে বললাম, কত টাকা রেখে যাবেন বলুন। তিনি বললেন, জাগতিক যা কিছু আছে সবই উপযুক্ত ভাবে নিয়োগের জন্য আমার কাছে দিয়ে যাবেন। আমিই হব তাঁর 'উইলের' অছি। আর উইল হল, মৃত্যুর পর তাঁর নশ্বরদেহকে চার টুকরো করে নৌকোয় চাপিয়ে আরব দরিয়ায় নিয়ে নৌকোর চার ধার দিয়ে জলে নিক্ষেপ করতে হবে। হেসে বললাম, যদি বোম্বাইতে মৃত্যু না হয়? সংক্ষেপে কড়া গলায় জবাব দিলেন, তা নিয়ে ডাক্তারকে মাথা ঘামাতে হবে না। আদেশ মতই যেন শেষ ইচ্ছা পালন করি।

এর পর ডাক্তার ভাটভাদেকর বাড়ির ভেতরে গেলেন স্ত্রীকে ডেকে আনতে। যোগীর দর্শন লাভই উদ্দেশ্য। কয়েক মিনিট বাদে স্বামী স্ত্রী ঘরে এসে দেখেন যোগী নেই। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শেষ ইচ্ছানুযায়ী আরব সাগরে চারখণ্ড দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল। ত্রৈলঙ্গস্বামীর মৃত্যুর ষোল বছর পরে ছোটে পরমহংসদেবের মহাপ্রয়াণ হয়—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।

এই কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর চিতাভস্ম গঙ্গায় লীন হয়েছে। পঁচিশ বছর বয়সে যখন তিনি প্রথম কাশীতে আসেন তখন হিন্দী ছাড়া কোন ভাষাই জানতেন না। বিশ বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কান্যকুব্জ গোষ্ঠীর এই ব্রাহ্মণ যুবক দাক্ষিণাত্যে পোস্টেড হন। একদিন শারীরিক প্রয়োজনে এক বেশ্যার কাছে গিয়ে মহা ফাঁপরে পড়লেন। বেশ্যা জানে তেলেগু, আর উনি জানেন হিন্দী। কেউ কারো ভাষা বোঝে না। তখন বেশ্যা সংস্কৃতে তাঁকে সম্ভাষণ করল। তিনি সংস্কৃতের বিন্দুবিসর্গ জানেন না দেখে বেশ্যা রেগে লাল হয়ে বলল, বামুনের ছেলে হয়ে সংস্কৃত জান না, লজ্জা করে না। সেদিনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাশীতে

চলে এলেন। তদানীন্তন কাশীর এক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের শরণাপন্ন হয়ে বললেন, আমি সংস্কৃত শিখতে চাই। পণ্ডিতজী হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই বয়সে আর সংস্কৃত শেখা যায় না।

যুবক দমলেন না। পণ্ডিতজীর টোলের গায়ে একটি কুয়োর পাড়ে গিয়ে চুপচাপ বসে শুনতে লাগলেন ছাত্রদের পঠনপাঠন। এইভাবে চলল ঝাড়া তিনটি বছর। প্রতিদিন ভোরে সকলের ঘুম ভাঙ্গার আগে পণ্ডিতজীর টোলের মেঝে ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করে গিয়ে বসে থাকতেন ওই কুয়োর পাড়ে।

তিন বছর শেষে একদিন পণ্ডিতজী পড়াতে এসে টোলে ঢুকে দেখেন, সেই যুবকটি নিত্যকার মত কুয়োর পাড়ে না বসে ছাত্রদের আসনে বসে। দেখে তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। যুবক তখন পণ্ডিতজীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—গত তিন বছর ধরে আপনি যা যা পড়িয়েছেন, সব আমি শিখেছি। আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। যদি আপনার শ্রেষ্ঠ ছাত্রের সঙ্গে আমাকে শাস্ত্রালোচনায় অনুমতি দেন, কৃতকৃতার্থ হব। পণ্ডিতজী এই যুবকের চ্যালেঞ্জে বিস্মিত হলেন, কিন্তু অনুমতি দিলেন। ঝাড়া দু' ঘণ্টা ধরে চলল শাস্ত্রালোচনা। শ্রেষ্ঠ ছাত্র হল পরাজিত। ক্রুদ্ধ পণ্ডিত রেগে গিয়ে বললেন—এস, আমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে সামিল হও। তখন পণ্ডিতজীর পা জড়িয়ে ধরে যুবক বললেন,—আপনি আমার গুরু। আমার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা আপনার পদতলে। আমাকে ক্ষমা করুন। এই যুবকই আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। দশাশ্বমেধ ঘাট ছিল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা।

সমসাময়িক যুগে বারাণসীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক স্বামী ভাস্করানন্দ থাকতেন দুর্গাকুণ্ডের কাছে। শুধু বৈদান্তিক নন, তিনি ছিলেন এক মহাযোগী।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ গার্হস্থ্য জীবনে ছিলেন বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। আধুনিক ভারতের এই

মহাপণ্ডিত মানুষটি তন্ত্রসাধনার বলে সমাধিলাভ করেন। জীবনের শেষ দিনগুলি কাশীতে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমেই তিনি কাটান।

আর কত নাম বলব। আধুনিক ভারতে প্রাচীন ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বলে যাঁরা খ্যাত, সেই তারাচরণ পরমহংস, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, শঙ্করচৈতন্য ভারতী (মৌনীবাবা), কাষ্ঠজিহ্বা স্বামী, বিহারীবাবা, খিচড়িবাবা, জ্ঞানানন্দ সরস্বতী, নিশ্চলানন্দ অবধূত এই কাশীতেই সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেছেন।

কবীর থেকে গোপীনাথ কবিরাজ, পাতঞ্জলি থেকে ছোটে পরমহংস —কাশীর দিব্যদেহধারী কাশীনাথদের ইতিবৃত্তের বর্ণনা শেষ করে শ্রীবাস্তবজী কখন যে কাশীর বিখ্যাত মেলা ও উৎসবের ইতিহাস-ভূগোল নিয়ে পড়েছেন তা টেরও পাই নি। মালাই ওপচানো খাঁটি দুধের চা দু'রাউনড্ শেষ। ঠক করে টেবলে আওয়াজ উঠতে টের পেলাম তৃতীয় রাউনড্ হাজির। কাশীতে এসে শ্রীবাস্তবজীর মত কথক ঠাকুর পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের!

ঠাকুর দেবতা যোগী মহাযোগী পণ্ডিত বৈয়াকরণ আর মেলা ও উৎসব নিয়েই বারাণসী। বারো মাসে তেরো পার্বণ নয়, বত্রিশ পার্বণের দেশ বারাণসী। আর প্রতিটি পার্বণের জন্য হাজার হাজার মাটির পুতুল তৈরি করেন মৃৎশিল্পীরা। ইতিহাস বলে কয়েক হাজার বছর ধরেই পার্বণ ঘিরে মৃৎ পুতুল নির্মানের রীতি প্রচলিত কাশীতে। যেমন রীতি তেমনি তার বৈশিষ্ট্য—নির্দিষ্ট পার্বণ দিনে ওই পার্বণীর যত হাজার পুতুল চাও পাবে, কিন্তু পরের দিন লাখ টাকা দিলেও একটি পুতুলও মিলবে না। এ যেন ভোজবাজী! পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও কাশীবাসীরা এই ভোজবাজী দেখেছেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। রাজা-রাজড়ার দিন শেষ। দেবতাদের মহিমাও ম্লান। এখন জনগণেশের প্রতিনিধিরাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাদের দাপটে দেব-দ্বিজ সমেত পূজা-অর্চনা, মেলা-উৎসব সবই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর

হচ্ছে মহিমায়, আকারে, প্রকারে। কেমন যেন অ্যানিমিক হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

বাংলাদেশে চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবে বছরের আয়ু শেষ। কাশীতে ঠিক উল্টো। সম্বত বছরের নববর্ষের সূচনা হয় চৈত্রের শুক্লপক্ষের এজমায়। সেই শুরু চৈত্র নবরাত্রের নয়দিন, নয়রাত ধরে চলে। নয় গৌরী ও দুর্গার পূজায় সমবেত হয় লক্ষ লক্ষ ভক্ত। এই উপলক্ষে কাশীর কুমারেরা গড়েন ছোট ছোট দুর্গা প্রতিমা। পূজা শেষে ভক্তরা প্রতিমা নিয়ে ঘরে ফেরেন। নতুন বছরের সব অমঙ্গল, দুর্গতি দুর্গার বরে দূর হবে এই বিশ্বাসে।

নববর্ষের তৃতীয় দিনে রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসেন কাশীতে। গণ-গৌরীর পূজা। কয়েকদিন ধরে চলে। মহাসমারোহে, ধুমধাম করে। এই উপলক্ষে গৌরীমূর্তি গড়েন শিল্পীরা।

নবরাত্রের শেষ দিনে রামনবমী। ভগবান রামচন্দ্রের জন্মদিন। প্রতিটি রাম মন্দিরে সেদিন উৎসবের জোয়ার। সেদিন পুণ্যার্থীদের স্নানযাত্রার কেন্দ্র গঙ্গার পাড়ে রামঘাট। পাশেই রাম মন্দিরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের পূজা চলে ঢোলক, খঞ্জীরার তালে তালে। গঙ্গার ঘাটে, মন্দিরের ধারে ঢেলে বিক্রি হয় নানান গড়নের রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মূর্তি।

রুদ্র বৈশাখ কৃচ্ছ্রতা ও সাধনার মাস। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ অনুযায়ী এই মাসে শুরু হয় পঞ্চক্রোশী তীর্থযাত্রা। কাশীধর্মক্ষেত্রকে অনুবর্তনই এই তীর্থযাত্রার লক্ষ্য। পথ পরিক্রমায় প্রায় পঞ্চাশ মাইল। রাস্তার ধারে ধারে তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ের জন্য রয়েছে তীর্থাবাস। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার রানী ভবানী এবং আরো অনেক ধনাঢ্য দাতা এই উদ্দেশে বেশ কয়েকটি তীর্থাবাস বানিয়ে দেন। চলার পথে পুণ্যার্থীরা ওই সব আবাসে বিশ্রাম নেয়। গোটা চলাটাই যেন এক বিশাল মেলা। মুগল যুগে সম্রাট, আমীর, ওমরাহরা যেমন চলমান সিংহাসন

অর্থাৎ স্নাট বেহারার তখৎ-ই-রওয়ানে চেপে যাতায়াত করতেন তেমনি পঞ্চক্রোশী তীর্থপরিক্রমা হাজার হাজার ভক্তের পায়ে পায়ে। এই উৎসব উপলক্ষে কোন পুতুল অবিশ্যি শিল্পীরা গড়েন না। অঘ্রাণেও অনুরূপ তীর্থপরিক্রমা হয়।

বৈশাখের অষ্টম দিনে দেবী শীতলার পুজো। দশাশ্বমেধ ও শীতলা ঘাটে ওই দিন মচ্ছব। চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের অষ্টম দিবসে একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয় শীতলা পুজো। শীতলার মূর্তি কিন্তু কুমোররা তৈরি করেন না।

শীতলা অষ্টমীর পর সপ্তাহবাদে বৈশাখী অমাবস্যা এবং তার ঠিক তিনদিন পরেই অক্ষয় তৃতীয়া। গঙ্গাস্নান ও দানের পক্ষে শাস্ত্রমতে বৈশাখী অমাবস্যা ও অক্ষয় তৃতীয়ার সমতুল্য দিন সারা বছরে আর একটিও নেই। অমাবস্যার সাত দিন বাদে পড়ছে গঙ্গা সপ্তমী—পুরাণমতে ওই দিনই দেবী গঙ্গা মর্ত্যে নামেন। ওই পুণ্যদিনে দেবী গঙ্গার মূর্তি নদীর ঘাটে ঘাটে ঢেলে বিক্রি হয়।

বৈশাখ শেষ হয় স্নানযাত্রায়। তার আগের দিন নৃসিংহ চতুর্দশী। ওই দিন বড় গণেশ ও প্রহ্লাদঘাটে বসে মেলা। নৃসিংহাবতারের হাতে হিরণ্যকশিপু বধের পালা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে কাশীতে নৃসিংহ অবতারের এবং বুদ্ধ পূর্ণিমার জন্য সারনাথে বুদ্ধজয়ন্তীর উপলক্ষে বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দশমী গঙ্গা দশেরা। ওই দিনেই হরিদ্বারে গঙ্গার আগমন। সেই উপলক্ষে ঐ দিন ঘাটে ঘাটে বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নানের ধুম। মকরবাহিনী গঙ্গা মূর্তি ওই দিনের বৈশিষ্ট্য। পরের দিন নির্জলা একাদশী। শুধু হিন্দু পুরুষদেরই ওই দিন নিরম্বু উপবাস করতে হয়। পঞ্চ গঙ্গাঘাটে সারাদিন ধরে চলে গঙ্গোৎসব। একশ বছর আগে ওই দিনে কাশীর হিরোরা গঙ্গা পারাপার প্রতিযোগিতায় নামতেন—এখন সে সবের পাট চুকে গিয়েছে।

আষাঢ়ের সপ্তদশ দিবসে রথযাত্রা। বর্তমান কাশী ক্লাবের কাছে রথতলায় বসে বিখ্যাত রথের মেলা। চলে তিনদিন ধরে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে এই মেলায়। এই মেলার সঙ্গে পুরীর রথযাত্রার রয়েছে ঐতিহাসিক যোগাযোগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে দুই ভাই পণ্ডিত বেনীরাম ও বিশ্বম্ভর রাম ছিলেন কাশীর দুই নামকরা নাগরিক। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বেনীরাম-ই ওয়ারেন হেসটিংসের প্রাণ বাঁচান। কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ হেসটিংস তাঁকে ওড়িশায় কটকের দেওয়ান করেন। এই বেনীরাম-এর পরিবারভুক্ত বহুজী বাঈ ও মছলি শহরের রাজা স্বতন্ত্র ভাবে স্বপ্নে আদেশ পান কাশীধামে জগন্নাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠার। তারই ফলশ্রুতি অস্সীর জগন্নাথ মন্দির এবং জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের চন্দনকাঠে বানানো দারুমূর্তি। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয় রথ এবং সেই বছর থেকেই কাশীর রথযাত্রার সূচনা। আগে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যা তিথিতে অস্সীতে মেলা বসত। এখন আর বসে না। পরিবর্তে আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথমা-নিশীথে তিনটি চতুর্দোলায় চাপিয়ে তিন দেববিগ্রহকে এনে তোলা হয় রথে। পরের দিন সকালে ওই রথ ভক্তরা টেনে নিয়ে যায় রথতলায়। তিনদিন ওই মেলা প্রাঙ্গনেই লক্ষ ভক্ত সমাবেশে রথে বিরাজ করেন ত্রিমূর্তি। তৃতীয় দিবসে শুরু হয় উল্টো রথের যাত্রার। ওই দিনই রাতে জগন্নাথ দেব প্রত্যাবর্তন করেন অস্সী মন্দিরে। রথযাত্রা উপলক্ষে মৃৎশিল্পীরা জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের নানা আকারের মূর্তি গড়েন। রথের মেলায় কাশীর বিখ্যাত মিষ্টি নানখাটাই বানান ময়রারা।

আষাঢ়া পূর্ণিমাতেই গুরুপূজা ও ব্যাসপূজা—দুই পূজাই অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যয়ন শেষে এই দিনে প্রাচীন ভারতে শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে ঘরে ফিরত। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে আজও কাশীতে ছাত্ররা ফল ফুল নিয়ে এই দিন শিক্ষকের বাড়িতে যান। আর মন্দিরে মন্দিরে পুরাণ-কথকদেরও এই দিন নিত্যশ্রোতারা প্রণাম জানান।

শ্রাবণ মাসের প্রতি রবিবার কাশীর দারানগরে বৃদ্ধকাল-মন্দিরে বৃদ্ধকাল মেলা বসে। কালই বৃদ্ধকাল মেলাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। আগের সেই ধূমধাম আর নেই।

দুর্গামেলা বসে শ্রাবণের প্রতি মঙ্গলবারে।' দুর্গাকুণ্ডের গায়ে বসে এই মেলা। দুর্গা এবং কাছের সংকটমোচন মন্দিরের হনুমানের পুজো দেয় লোকে। শেষ মঙ্গলবারেই জমে ওঠে মেলা। লাখো মানুষের ভিড় হয়। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ওই দিন চলে এই মেলা।

কর্ক সংক্রান্তির দিন শঙ্খধারা তালাও এবং কাছের দ্বারকাধীশের মন্দিরে বসে শঙ্কুধারা মেলা। সোয়া শ' বছর আগেও এই মেলা ছিল কাশীর এক মস্ত আকর্ষণ। এখন কোন রকমে টিঁকে আছে।

শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কাশীর বিখ্যাত কার্কোতক বাপী বা নাগকূঁয়ায় বসে নাগ পঞ্চমীর মেলা। পূজিত হন কার্কোতক নাগ। পুরাণ মতে বৈয়াকরণ পাতঞ্জলি আজ যেখানে কূঁয়া, একদিন সেখানে বসেই শিষ্যদের মহাভাষ্য শিখিয়েছিলেন। ওই পৌরাণিক ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানাতে অতীতে এই মেলায় দেশের সেরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সমাবেশ ঘটত। এখন ওসব চুকেবুকে গেছে। এই নাগপূজা উপলক্ষে নানা ধরনের সাপের মূর্তি বিক্রি হয়।

নাগপঞ্চমীর ঠিক এক সপ্তাহ বাদেই শুরু হয় ঝুলন মেলা। কাশীর তাবৎ কৃষ্ণমন্দিরে সুন্দর করে সাজানো দোলনায় দোলানো হয় আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণকে। পাঁচদিন ধরে চলে এই উৎসব। মেলার শেষ দিনে রাখী বন্ধন। দুর্গাকুণ্ডের কাছে তুলসীমানস মন্দির এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বিশ্বাসনের মন্দির ঝুলন মেলার প্রধান আকর্ষণ। তাছাড়া রামনগরের রামবাগে কাশীর রাজাদের ঝুলন উৎসবও দেখার জিনিস।

শ্রাবণের শেষ দিনে রাখীবন্ধন উৎসব। ইতিহাস বলে এই

উৎসবের শুরু মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সময়। এক বিপন্ন রাজপুত রমণী হুমায়ুনকে দাদার শ্রদ্ধায় রাখী পরিয়ে দিয়েছিলেন। এই দিন কাশীর ব্রাহ্মণরা পরিচিত অপরিচিত সকলের হাতে রাখী পরিয়ে দিয়ে প্রণামী আদায় করেন। নানান গল্প প্রচলিত এই উৎসবের মাহাত্ম্য ঘিরে। গত শতাব্দীর শেষ দিকের একটি ঘটনা। কাশীর এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাড়ীর সামনে একটুকরো জমি আদায়ের জন্য নানা ফন্দি-ফিকির, কোর্ট কাছারি করে নাজেহাল হয়ে শেষমেশ শ্রাবণ সংক্রান্তিতে শত্রুর হাতে রাখী বেঁধে দান হিসাবে চাইলেন ওই জমিখণ্ড। লোকশ্রুতি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল।

আধুনিক কাশী হতভাগ্য। ভাদ্রপদের তৃতীয় দিনে ভোর থেকে মহিলারা রঙীন শাড়ি পরে হাত ধরাধরি করে নগর সংকীর্তনের সঙ্গে যে কাজলি গান করতেন তার পাট আজ উঠে গেছে। পঞ্চাশ বছর আগেও এই কাজলি তিজ বা কাজলি গানের উৎসব চলত গোটা ভাদ্র মাসভর। ঝুলন উৎসবের রেশ মিটতে না মিটতে ক্ল্যাসিক্যাল কাশী গানে উৎসব মেতে উঠত। তখন ঈশ্বরগঙ্গী ও শঙ্খধারায় এই উপলক্ষে মেলাও বসত। আজ এই প্রথার, এই উৎসবের, এই মেলার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই।

কাজলি তিজ উৎসব শুরুর পাঁচ দিন পরেই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। কাশীর সব বিষ্ণু ও কৃষ্ণমন্দির এই দিন ভক্তের ভিড়ে, প্রসন্দীর ফুল ফলে উপচে ওঠে।

কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর এগারো দিন বাদে, ভাদ্র মাসের উনিশ দিনের মাথায় গণেশ চতুর্থী। গণেশের জন্মদিন। সাত দিন ধরে চলে এই উৎসব। বিশেষ করে বারাণসীর মারাঠীদের ঘরে ঘরে। শহরের সাতটি কেন্দ্রে বিপুল সমারোহে গণেশের পূজা হয়। বিশেষ করে রামঘাটে সঙ্গবেদ বিদ্যালয় এবং অগ্নীশ্বরঘাটে (নয়া ঘাট) পেশোয়ার গণেশ মন্দিরে। ওই গণেশ মন্দিরে বড় একখণ্ড প্রবাল কেটে এক ফুট উঁচু গণেশের মূর্তি রয়েছে।

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিবসে অনুষ্ঠিত হয় সূর্যপূজা বা লোলার্ক-প্রণাম। ভাদাইনির লোলার্ককুণ্ডে এই উপলক্ষে বসে বিরাট এক মেলা। ওই কুণ্ডে স্নান সেরে হাজার হাজার মহিলা কুমড়ো অর্ঘ্য দেন সূর্যদেবকে। প্রতিটি কুমড়োর গায়ে ফোটানো থাকে অজস্র সূঁচ। সূর্যরশ্মির প্রতীক ওই সব সূঁচ। পঞ্চাশ বছর আগেও কাশীতে লোলার্ক-ষষ্ঠী মহিলাদের পূজা বলেই গণ্য হোত। এখন দিন বদলেছে। মহিলাদের মনোপলি পুরুষরা কেড়ে নিয়েছে। লোলার্ক বা সূর্য-ষষ্ঠীর পূর্ব গৌরব আর নেই। তবু মেলা বসে। বিশাল মেলা। এক প্রান্তে লোলার্ক-কুণ্ড, অন্যপ্রান্তে সাধক কিনারামের সমাধির জন্য বিখ্যাত ক্রিমিকুণ্ড। উত্তরভারত এবং গুজরাট থেকে বাবা কিনারামের মন্ত্রশিষ্য অবধূতরা দলে দলে আসেন। সারারাত ধরে বাবার সমাধি ঘিরে কাশীর বাঈজীরা গান গান, নাচেন। তাঁদের বিশ্বাস বাবার কৃপায় তাঁরা হবেন আরো সুকণ্ঠী, তাঁদের নাচও হবে আরো উন্নত মানের।

লোলার্ক-ষষ্ঠী শেষ হতে না হতেই ভাদ্রের শুক্লা সপ্তমীতে কাশী মেতে ওঠে মহালক্ষ্মীর পূজায়। ধন দৌলতের অধীশ্বরী মহালক্ষ্মীর পূজার প্রধান কেন্দ্র লক্ষ্মীকুণ্ড। এই উপলক্ষে যে মেলা বসে তার নাম ষোড়াহিয়া মেলা অর্থাৎ ষোড়শ দিন বা ষোল দিনের মেলা। গঙ্গা থেকে সুড়ঙ্গ কেটে লক্ষ্মীকুণ্ডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে। জোয়ারে গঙ্গার জলে কুণ্ড ফেঁপে ফুলে ওঠে। লক্ষ্মীর কৃপালাভের আশায় পুণ্যার্থীরা ওই দিন ভোর থেকেই পবিত্র কুণ্ডে স্নান শুরু করেন।

ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশী বামনাবতারের জন্মদিন। বামন দ্বাদশীতে বরুণাসঙ্গমে স্নান করলে অক্ষয় স্বর্গবাস। ওই সঙ্গমের কাছেই বামন-কেশবের মন্দির। সারাদিন ধরে চলে স্নান, দান, পূজা-আর্চা।

ষোড়াহিয়া উৎসবের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় জীবৎপুত্রিকা, যার অপভ্রংশ হল জুইতিয়া। এই দিন মা সন্তানের মঙ্গল কামনায়

সারাদিন নিরম্বু উপবাস করেন। কখনো কখনো উপবাস-পর্ব চলে দেড় দিন ধরে। উপবাসান্তে ঈশ্বরগঙ্গী তালাও-এর ধারে মন্দিরে মন্দিরে মায়েরা দেন পুজো। দেড়শ বছর আগে এই উৎসবের স্নান-পর্বের জন্য কাশীর বুকেই ছিল জুইতিয়া তালাও। আজ নেই। হেজেমজে গিয়েছে। যারা জানে না, ভুল জানে তারা—এই দিনটিকে মহালক্ষ্মীব্রত মনে করে লক্ষ্মীকুণ্ডে যায় স্নান করতে।

জুইতিয়া বা জীবৎপুত্রিকার এক সপ্তাহ বাদেই শুরু হয় দুর্গাপূজা। কাশীতে যাকে বলে আশ্বিন নবরাত্র। টানা নয় দিন ধরে চলে পূজা ও উৎসব। মূলত বাঙালী পুজো। মাটির প্রতিমা গড়ে মন্দিরে মন্দিরে, মণ্ডপে মণ্ডপে চলে পূজা ও উৎসব। ন' দিনের পুজো শেষে বিজয়া দশমীর দিন মিছিল করে দশাশ্বমেধ ঘাটে দুর্গামূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় বিসর্জনের জন্য।

বিজয়া দশমীর দিনেই রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করেন রাম। জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে কাশী। পরদিন রামলীলার অবসান, ভরত মিলাপ। অনন্ত চতুর্দশী থেকেই রামলীলা শুরু হয়ে যায়। শেষ হয় বিজয়া দশমীতে। রাম ফিরে আসেন অযোধ্যায়। মিলন হয় ভরতের সঙ্গে। কাশীর সবচেয়ে বড় নিজস্ব উৎসব এই বিজয়া দশমী, রামলীলা ও ভরত মিলাপ। কাশীর জনজীবনে রামলীলার গুরুত্ব অপরিসীম। অন্তত চল্লিশটি জায়গায় রামলীলা চলে। রামের জীবনী তুলসীদাস যেভাবে রামচরিতমানসে লিখেছেন, তারই কাহিনী অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় কাশীর রামলীলা। জনশ্রুতি—কাশীতে রামলীলার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত তুলসীদাসের হাতেই। পরে তাঁর বন্ধু ও শিষ্য মেঘ ভগৎ এই উৎসবকে জনপ্রিয় করে তোলেন। নটি ইমলির রামলীলা মেঘ ভগৎ-এর কল্পনা ও উদ্যোগে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই রামলীলাকে কেন্দ্র করে কত গল্প, কত উপন্যাস। মাত্র ১১৪ বছর আগের কথা। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। বরুণা-গঙ্গা সঙ্গমে সেদিন হনুমান সীতা অন্বেষণে সাগর লঙ্ঘন করবেন। চৌকা ঘাটে চলছিল রামলীলা।

ওই ঘাটের পাশেই থাকতেন একদল ইউরোপীয় মিশনারী। রামলীলার চীৎকার চেঁচামেচি হৈ হট্টগোলে তাঁরা তিত-বিরক্ত। তাঁদের তরফে রেভারেণ্ড ম্যাকফারসন ঠিক করলেন কাশীর কালেক্টর ব্যাকসকে ডেকে দেখাবেন—এই রামলীলা তাঁদের মনঃসংযোগের কী পরিমাণ ক্ষতি করছে। ম্যাকফারসনের অনুরোধে ব্যাকস এলেন রামলীলা দেখতে। সীতার সন্ধানে হনুমানবেশী টেকরাম তখন প্রস্তুত সাগর-কল্প বরুণা লঙ্ঘনে। বরুণা ক্ষীণকায়া হলেও জোয়ারের জলে তখন ভরাভরতি। কোন অবস্থাতেই ওই নদী এক লাফে পেরোনোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। জেনে শুনে সাহেব-সন্ন্যাসীরা ব্যঙ্গ করে বললেন, হনুমান যদি সাগর লঙ্ঘন করতে পারে তাহলে টেকরাম কী বরুণাও পেরোতে পারে না? ঠাট্টা বিদ্রূপে টেকরাম উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। কারো কথা না শুনে, জয় হনুমানজী কি বলে লাফ দিলেন। সবার চোখ যখন নদীর জলে তখন বিস্ময় ও বিষাদের মধ্যে দর্শকরা আবিষ্কার করলেন নদীর অপর পাড়ে ধুলো ঝেড়ে উঠছেন টেকরাম। এরপর সাহেব-সন্ন্যাসীরা টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করেন নি। ব্যাকস যতদিন কাশীর কালেক্টর ছিলেন, রামলীলাকে উৎসাহ ও সাহায্য দিয়েছেন। পরাধীন ভারতে ম্যাকফারসন-টেকরাম উপাখ্যান রামলীলাকে নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল। যুগে যুগে অত্যাচারীর ভেক বদলায়। রামলীলার চিরাচরিত কাহিনীর রূপকও বদলে যায় সেই মত। তাই রামলীলা আজো কাশীর সেরা উৎসব।

কার্তিক মাসের ত্রয়োদশ দিবস ধন তেরস উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট। কাশীর থাঠেরী বাজার, কাশীপুরায় তামা কাঁসা পেতলের থালা, ঘটি, বাটি, গামলা হাড়ি উপচে পড়ে দোকানে দোকানে। দুর্গাপুজোর সময় যেমন বাঙালী নতুন জামা কাপড় কিনবেই, তেমনি ধন তেরসের দিন কাশীবাসীরা সাধ্যমত কিছু না কিছু হাড়িকুড়ি কিনবেন। এই দিনটি আবার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জনক ধন্বন্তরীর জন্মদিন। কাশীর আয়ুর্বেদজ্ঞদের ঘরে ঘরে এই দিন চলে ধন্বন্তরীর পূজা।

পরের দিন আবার হনুমান পূজা। পুরাণ মতে ওই দিন হনুমান অযোধ্যায় গিয়ে ভরতকে খবর দিয়েছিলেন, চোদ্দ বছর বনবাসের পর নিরাপদে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে ঘরে ফিরছেন। হনুমান পূজার পরের দিন অমাবস্যা—দেওয়ালী। ওই দিন ঘরে ঘরে কালীপুজো। পাশাপাশি চলে লক্ষ্মীপুজো। আগে এই উপলক্ষ্যে জুয়া খেলার ধূম পড়ে যেত। পর পর দুদিন ধরে। সরকারী অনুমোদনেই। সেসব এখন বন্ধ।

দেওয়ালীর পরের দিন অনুষ্ঠিত হয় অন্নকূট মহোৎসব। মন্দিরে মন্দিরে, বিশেষ করে বিশ্বনাথ ও গোপাল মন্দিরে। এই দুই মন্দিরে অন্নকূট মহোৎসবের আয়োজন হয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি কারণে। কাশীর বিশ্বাস এই দিনেই দিবোদাস কর্তৃক বিতাড়িত শিব কাশীতে ফিরে এসেছিলেন। এই প্রত্যাবর্তনকে আনন্দময় করে তোলার জন্য বিশ্বনাথ মন্দিরের মূল কক্ষে বৈকুণ্ঠেশ্বরকে ঘিরে বানানো হয় এক মন্দির। লাড্ডুর মন্দির। হাজার হাজার তামা পেতলের থালায় লাখ লাখ মিষ্টি অর্ঘ-স্বরূপ নিবেদিত হয়। লাখ লাখ ভক্ত সমাগমে বিশ্বনাথ মন্দিরে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। পরের দিন ওই সব লাড্ডু ও মিষ্টির প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আর গোপাল মন্দির এবং কাশীর অন্যান্য বিষ্ণু মন্দির ও বৈষ্ণব পরিবারে কৃষ্ণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিন হিসাবে কৃষ্ণ পূজিত হন। পুরাণ বলে, ওই দিন মথুরায় ইন্দ্রের পূজা নিষিদ্ধ করে কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধনের পূজা প্রবর্তন করেন। এই উপলক্ষে ধনী বৈষ্ণব গৃহে তিন চারশ পদ মিষ্টি ও রান্নাপদ নিবেদন করা হয়। গোটা কাশী মেতে ওঠে মেলায়। লক্ষ্মী, গণেশ, হনুমানের মূর্তি ঢেলে বিক্রি হয়। এই দিন থেকেই তুলসীঘাটে শুরু হয় কৃষ্ণলীলা। রামলীলার মত কৃষ্ণলীলারও প্রবর্তক তুলসীদাসজী। চোদ্দ দিন ধরে গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণজীবনী অনুসারে পালা চলে। শেষ দিনে নদীর পাড়ে বসানো এক কদম্ব গাছ থেকে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন কৃষ্ণবেশী অভিনেতা।

পর মুহূর্তে হাজার হাজার দর্শকের সামনে জল ফুঁড়ে কৃষ্ণ উঠে আসেন রবারের তৈরি কালীয় নাগের সহস্র ফণায় চেপে।

কার্তিকের শেষ উৎসব কার্তিকী পূর্ণিমায়। এই দিনেই কার্তিক বা স্কন্দের পূজা। লাখ লাখ মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে বেতের ডালায় সাজিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন ভক্তরা।

মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণের অষ্টম দিবস কালভৈরবের আবির্ভাব দিন। এই দিন দুপুরে সাধারণের কাছে কালভৈরব মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। ওপরের ঢাকনা সরানোর ফলে ভক্তরা এই একটি দিনের জন্য সিঁদুর রাঙা কালভৈরবকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পান। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো কালভৈরবের এক পা একটি কুকুরের পিঠে, ডান হাতে ত্রিশূল।

অগ্রাণের উনত্রিশ দিনে পিশাচমোচন তালাও-এর কাছে বসে লোটা-ভানটা মেলা। বহু শতাব্দী আগে জনৈক লোটুম ভট্ট এই মেলা বসান।

পৌষ—উৎসব ও মেলার দিক থেকে বড়ই ন্যাড়া। পর্ণিমার দিন মাহাত্ত ঘাটে বদরিনারায়ণের পূজা হয়। এই দিন থেকেই প্রয়াগ ঘাটে শুরু হয় মাঘী স্নান—চলে মাস ভর।

মাঘের চতুর্থ দিনে মহারাজ বিনায়কের পূজা। লোকে বলে বড়া গণেশ। এই পুজো ছাত্র ছাত্রীদের। বাংলাদেশে যেমন সরস্বতীর পুজো তেমনি কাশীতে গণেশের—কারণও একই, লেখাপড়া, পরীক্ষা পাশ ইত্যাদি।

মাঘের প্রতি সোমবার বেদব্যাস পান পূজা। এই দিনগুলি ভক্তরা কাশী নরেশের রামনগর দুর্গে গিয়ে ব্যাসেশ্বরকে পূজা দেন।

মাঘের বিংশতি দিনে ঘরে ঘরে হর-পার্বতীর পূজা হয়। দেবাদিদেব শিবকে হলুদ দোপাট্টা অর্ঘ দিয়ে ভক্তজন নিজেরাও গায়ে জড়ান ওই রংয়ের নতুন দোপাট্টা। আমের মঞ্জরী ও গ্যাঁদা ফুল দিয়ে প্রণাম জানান বিশ্বনাথকে। এই দিন থেকেই শুরু হয় বসন্ত পঞ্চমী উৎসব।

মাঘ শেষ হয় মাঘী পূর্ণিমা উৎসবে। মাঘের শেষ দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে হাজার হাজার পুণ্যার্থী স্নান করেন।

মাঘ শেষ, এল ফাল্গুন। ফাল্গুনের চতুর্দশ দিবসে শিবরাত্রি। কাশীর পবিত্রতম দিন। কাশীদেব শিবের পূজায় গোটা শহর ওঠে মেতে। সব পথ এই দিন এসে শেষ হয়, মেশে বাবা বিশ্বনাথের চরণে।

শিবরাত্রির তেরোদিন পরে পড়ছে আমলকি একাদশী। লোকমুখে রঙভারী একাদশী। কাশীর দোল। বাবা বিশ্বনাথের চরণে আবীর ও গুলাল নিবেদন করে শুরু হয় হোলি-উৎসব। দোল ও ফাল্গুন শেষ হতেই ঘুরে আসে নতুন বছর! সামনে চৈত্র শুক্লা প্রথমায় নবরাত্র উৎসব ঘিরে কাশী হেসে উঠবে।

থামলেন শ্রীবাস্তবজী। চা-ও শেষ। দাম চুকিয়ে দিতে দিতে বললেন, পঞ্জিকা আর ক্যালেনডারের পাতাতেই এই সব পূজা, মেলা ও উৎসবের ঠিকানা পাবেন। কাশীর আর সেই দিন নেই—মুড, মেজাজ কিচ্ছু নেই। তাই আমাদের ছেলেবেলাতেও এই সব পুজো-মেলার যা জৌলুশ দেখেছি আজ আর দেখি না। সব কেমন ম্যাড়মেড়ে। সে কাশী আর নেই।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে দুজনে হাঁটছি। অলস, অন্যমনস্ক। হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তায় একটা ছোট জটলা! ব্যাপার কী? ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি এক মাড়োয়ারি দম্পতি কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। ভদ্রমহিলার হাতে একটা শাড়ির প্যাকেট। তাদের ঘিরে রাস্তার দুধারের শাড়ির দোকানের সেলসম্যানরা। মন্দিরের পাণ্ডারাও লজ্জা পাবে এই সেলসম্যানদের কাছে। এক একটা ছিনে জোঁক। রাস্তা থেকে খদ্দের ধরাই এদের কাজ। পাল্লায় পড়লে আর রক্ষা নেই। টুরিস্ট জানলে হোটেল বা ধর্মশালার নাম, ঘরের নম্বর মুখস্ত করে রাখবে। একবার যে এদের পাল্লায় পড়েছে

তার মুখের ফটোগ্রাফ এদের চোখের কৌটোয় পাকাপাকি ভাবে ফিক্সড ডিপোজিট। দোষের মধ্যে এই মাঝবয়সী দম্পতি অনুরোধ এড়ানোর জন্য কয়েকজন বেনারসী শাড়ীর পাণ্ডাকে কথা দিয়েছিলেন কিনলে তাদের দোকান থেকেই কিনবেন। তারপর অন্য দোকান থেকে সওদা সেরে গোপনে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছেন।

ভদ্রলোক যত বলছেন জেবে আর একটা আধলাও নেই, তত শাড়ি-পাণ্ডাদের গলা চড়ছে, থাকবে কি করে, যা ছিল তাই দিয়েই তো শাড়ি কেনা হয়েছে। তবে কেন কথা দিয়েছিলেন? ঠিক আছে কিনতে হবে না। একবার দোকানে আসুন তো।

শাড়ি বা শাড়ির দোকানের ডাক কোনদিন কোন মহিলা অগ্রাহ্য করেছেন বলে আমি অন্তত জানি না। গড়িয়াহাটার মোড় যে এত রমণীয় তাতো শাড়ীর দোকানগুলো আছে বলেই। দোকানের শো কেসে মাছির মত সেঁটে থাকতে দেখেছি মহিলাদের। দেখে মনে হয়েছে শাড়ির দোকানগুলো হয় পাকা ফোঁড়া নয় রসগোল্লার হাঁড়ি। শাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে গুপ্ত প্রেমিকও পটকে যাব। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের চোখের মণি অসন্তোষভাব। অথচ ভদ্রমহিলা নির্লিপ্ত। ভাবখানা, কর্তা যদি রাজি হন, গিন্নির তাহলে কোন আপত্তি নেই। মোটে তো একটা প্যাকেট কেনা হয়েছে, আর দু দশটা দেখলে বা কিনলে ক্ষতি কি? উত্তেজনায় মাড়োয়ারি ভদ্রলোক দুপাযের ধুতির খুঁট দু'দিক থেকে টেনে টেরিকটের পানজাবির ঝুল পকেটে ভরে ফেললেন—মাসলহীন একজোড়া থলথলে পা। হাড় ফাড নেই। কাঁপছে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামছে। শ্রীবাস্তবজী আমার সোয়েটারটায় টান মেরে বললেন, গাঙ্গুলী, এই ভিড়ে দেখার কিছু নেই। এটা কাশীর আর একটা ফিচার, এরা কাশীর পাণ্ডাদের আর একটা ট্রাইব। তার চেয়ে দ্যাখ ওই দোকানে কারা ঢুকছে।

শ্রীবাস্তবজীর টানে ভিড় থেকে মুখ ফিরিয়ে পেছনের মারকারি

ভেপার ল্যাম্প ও নিয়ন আলোয় ঝলমল বেনারসী শাড়ীর দোকানের সিঁড়িতে দেখি রমেশ ও মহেশ। হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে মাঝখানে সন্ধ্যাকে নিয়ে ফরাসী মাসকেটিয়ারদের মত দোকানে ঢুকছে। সব ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, ও না বিবাহিত! পুনেতে ওর ঘরদোর, স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি। আর এখানে, এই কাশীতে ওর কি সে সব কথা কিচ্ছু মনে নেই?

ঃ কি হল গাঙ্গুলী? আর ইউ শকড্?

লজ্জা পেলাম। হাসিও পেল। মন কখন কিভাবে যে ভাবায়, নাচায়—কে বলতে পারে? আমার সঙ্গে যখন সন্ধ্যা বেরোয় তখন তো কই ভাবি না—ও কুমারী, কি বিবাহিতা! আসলে খুব বড় সাইজের একটা মুখোস এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভেতরে ভেতরে এই কাশীর মতই সংস্কারে পুরনো, ধ্যান-ধারণায় একটি মহাস্থবির আদি বিশ্বেশ্বর। শিবলিঙ্গের মত অজর অক্ষয় অমর সংস্কারের মনুষ্যমূর্তি মাত্র।

আট

গতকাল রাতে আমাদের ফেয়ারওয়েল ডিনার হয়ে গেল। কোরস ফিনিশ। রিটার্ণ টিকিট, আসার গাড়িভাড়া সব হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হল। বেশ কয়েকটা দিন একসঙ্গে কাটার ফলে এখন স্লাইট একটা চিনচিনে ব্যথা ফিল করছি। বসন্ত আগেই ফিরে গিয়েছে কটকে। এবার আমাদের পালা। কেউ যাবে আমেদাবাদ, কেউ দিল্লি, কেউ পুনে, কেউ ব্যাঙ্গালোর, কেউবা কোট্টায়াম, কেউ বেজোয়াদা। আমি ফিরব কলকাতায়।

শুতে রাত হয়ে গিয়েছিল। হোলকার হাউসে, কাশীতে শেষ রাত। শ্রীবাস্তবজী, ডঃ পটেকর দু'জনেই অনেক রাত অবধি ছিলেন। ডঃ পটেকর একটার পর একটা গজল শোনালেন। নির্জন শীতের রাতে, বাইরে যখন নিঃসঙ্গ অর্জুন গাছ একটি একটি করে পাতা খসাচ্ছিল তখন ঘরের ভেতরে একটির পর একটি অনুরোধ মেনে নিয়ে প্রায়-বৃদ্ধ শিক্ষক মানুষটি কিসের যেন তাগিদে সাধক-গায়ক হয়ে উঠছিলেন।

একে একে সবাই যে যার ঘরে চলে গেল। ভোরে উঠতে হবে। কারো ট্রেন সকালে, কারো রাতে। আমার ট্রেন আসবে রাত সাড়ে সাতটায়। তাই তাড়া ছিল না। শেষ গানটি শুনিয়ে ওঠার সময় পটেকরজী আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন—কলকাতায় ফিরে গিয়ে ভুলে যাবেন না তো? লিখবেন তো আমার কথা?

সত্যি কথা মুখে এল না। আবেগ জড়িয়ে অসম্ভব মিথ্যা বললাম —ভুলতে পারি পটেকরজী? আমার যতটুকু সাধ্য নিশ্চয় করব জানবেন।

—তাতেই আমার হয়ে যাবে। একবার কলকাতা আমাকে ডাকুক, তারপর দেখিয়ে দেব, পঁয়ত্রিশ বছরের সাধনা আমার মিথ্যে নয়।—পরম বিশ্বাসে প্রায় বরফের মত ঠাণ্ডা রাতে মানুষটি বিদায়

নিল। বলতে পারলাম না—পটেকরজী, যে টিচার ঠুংরী, খেয়াল শেখায়, সেকি কখনো অতুলপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রগীতির মাস্টারি করে? সাংবাদিকতায় আমার বিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও পলিটিকস। গান-বাজনা, নাটক, নাচ, যাত্রার জন্য সব কাগজে আলাদা আলাদা একসপারট আছেন। আমি বড় জোর ফিরে গিয়ে আপনার কথা তাদের বলতে পারি। লেখালেখি তো তাদের ব্যাপার।

ঘুম ভাঙ্গল বেশ জোরে কড়া নাড়ার শব্দে। উঠে দরজা খুলে দেখি মহেশ দাঁড়িয়ে। ঝকঝকে উজ্জ্বল যুবক। হেসে বলল—গাঙ্গুলী, যাচ্ছি। আটটায় ট্রেন। স্কুটার-রিক্সা এসে গেছে।

—জাসট আ মিনিট। আমি এখুনি আসছি।

তাড়াতাড়ি মুখে চোখে জল দিয়ে নীচে নেমে এলাম। চার-পাঁচটা স্কুটার-রিক্সা দাঁড়িয়ে। মালপত্র উঠছে। বালচন্দ্রম, স্কারিয়াস, আলেকজাণ্ডার, বোম্বাই টী. ভি-র গোবিন্দ শুক্লে, কর্ণাটকের কন্নাড়া প্রভার শ্রীহর্ষ, রায়পুরের দিবাকর মুক্তিবোধ, রমেশ মহেশ হাতে হাতে ব্যাগ-ব্যাগেজ তুলছে। ফাঁকে ফাঁকে এ ওর ঠিকানা লিখে নিচ্ছে। যদি কখনো ওদের শহরে যাই, তার জন্য আগাম নেমন্তন্ন রইল। হাসতে হাসতে, হাত নাড়তে নাড়তে যে যার স্কুটার-রিক্সায় উঠছে। একটি একটি করে ছেড়ে যাচ্ছে। আর শুধু একটি বাকি। রমেশ ও মহেশ একই স্কুটার-রিক্সায় স্টেশনে যাচ্ছে। ওরা কি কারো জন্য অপেক্ষা করছে?

ঠিক তখুনি দরজার আড়াল থেকে খুব মৃদু স্বরে কে যেন আমাকে ডাকল—শুনুন—

দরজার একটা পাল্লা বন্ধ। অন্যটি আধো খোলা। এক জোড়া কালো চোখ ওই আধখোলা পাল্লার আড়ালে। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে শুনতে পেলাম—এক মিনিটের জন্য একবার ভেতরে আসুন।

কি ব্যাপার? না বুঝে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে সন্ধ্যা আধখোলা পাল্লাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আমার ডান

হাতটা ওর বাঁ হাতে। ওর ডান হাতে কালো সরু এক সুতো। মণিবন্ধে ওই কালো সুতোটা জড়িয়ে দিতে দিতে বলল—বিশ্বনাথের আশীর্বাদী মঙ্গলসূত্র। কখনো খুলবেন না।

—কবে গিয়েছিলে মন্দিরে ?

—কাল বিকেলে। আপনার জন্য পুজো দিতে।

—আমার জন্য ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—বলতে পারব না। আপনার ট্রেন তো রাতে ?

—হ্যাঁ।

—আমার এই ব্যাগটা গাড়িতে তুলে দেবেন ?

—দিচ্ছি চল।

আমি ব্যাগটা নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে মহেশ ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল। তাহলে ওরা তিনজনই একই গাড়িতে যাচ্ছে।

একটু বাদেই সন্ধ্যা বেরিয়ে এল। সকালের রোদ ওর এলোচুল, নাকের ডগা, ঠোঁটের কোণে আলতো ভাবে পড়েছে। রমেশ ও মহেশ বারবার ওদের ঠিকানা দিয়ে বলল—গাঙ্গুলী, একবার অন্তত আসা চাই।

বললাম—যাব, নিশ্চয় যাব।

ভট ভট করে হ্যানড স্টারটারের আওয়াজ উঠল। স্কুটার-রিক্সা ছাড়ছে। রমেশ ও মহেশের মাঝখানে সমস্ত শরীরটা গুটিয়ে বসে আছে সন্ধ্যা।

হেসে বললাম—সবাই তো নেমন্তন্ন করল সন্ধ্যা, তুমি করবে না ?

সোজা আমার চোখে চোখ রাখল। কয়েক সেকেণ্ড। মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুনেছি কেউ কেউ নাকি জ্যোতিষীর মত চোখের

ভাষা অব্যর্থ পড়তে পারেন। আমি নিতান্ত নির্বোধ। আমার চোখের ওপর দিয়ে স্কুটার-রিক্সাটা ওদের তিনজনকে নিয়ে চলে গেল।

এই বিশাল হোলকার হাউসে আমি এখন একা। শুনেছি কাল থেকে বি এইচ. ইউ.-তে অল ইনডিয়া ইংলিশ টিচারস কনফারেন্স শুরু হবে। ওই সম্মেলনের জন্য দেশের বিভিন্ন ইউনিভারসিটি ও কলেজ থেকে শিক্ষকরা আসবেন। তাঁরা এসে উঠবেন এই হোলকার হাউসে। দশটা নাগাদ ফার্স্ট ব্যাচ এসে পৌঁছোনোর কথা। তার আগেই পালাতে হবে।

ঘরে ফিরে আমার স্যুটকেসটায় বাসী জামা-কাপড় ও পড়া-অপড়া বইগুলো গুঁজে দিলাম। স্নান সেরে নিলাম। ট্রেনের টিকিটটা দেখে নিলাম। তারপর নিজেই বেরিয়ে গেলাম একটা স্কুটার-রিক্সা ডাকতে। সারাদিনের জন্য ভাড়া করে ফিরে এলাম। স্যুটকেস গাড়িতে তুলে যখন বেরোচ্ছি, ঠিক তখুনি পর পর দুটি স্কুটার-রিক্সা এসে ঢুকল। দু'জন ক্লান্ত মানুষ, চোখে ট্রেন জারনির ট্রাবল, মালপত্র সমেত এলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাই? দুর্গাকুণ্ড রোড ধরে যেতে যেতে সেই উদ্বাস্তু ক্যামপের বাড়িটা চোখে পড়ল। একবার নেমে দেখা করে যাব? না, থাক। কোন উপকার না করতে পারি, ওদের অসহ্য যন্ত্রণাময় শান্তিটুকু কেন নষ্ট করি?

ভাবলাম একবার মণিকর্ণিকায় যাব। কিন্তু ওই গলিতে তো স্কুটার-রিক্সা ঢুকবে না। তাহলে যাই একবার অস্‌সীতে মুমুক্ষু ভবনে। যদি রামেশ্বর ডোলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়। না, থাক। কি হবে এক মোক্ষকামীকে এই ভর দুপুরে বিরক্ত করে? স্কুটার-রিক্সাওয়ালাও বোধহয় বিস্মিত। একবার এই রাস্তা, পর মুহূর্তে অন্য রাস্তা, তার পরের মুহূর্তে আবার পুরোনো রাস্তায়। বোধহয় ভাবছে লোকটা পাগল।

শেষ দুপুরে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা হোটেলে পেট ভরে

মাছ-ভাত খেলাম। তারপর গাড়িটা নিয়ে সোজা গেলাম ঘাটে। গাড়ি থেকে নেমে, স্কুটার-রিক্সাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে ঘাটের কানায় পা ঝুলিয়ে বসে তাকিয়ে রইলাম গঙ্গার দিকে।

দুপুর ফুরিয়ে গেল। বিকেল ছায়া নিয়ে নামছে। ঘাটের চেহারা বদলাচ্ছে। রাশি রাশি গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে ব্যাপারীরা এসেছে। মাঝিরা নৌকা লাগাচ্ছে ঘাটে। ফরেন টুরিস্টদের সঙ্গে দরদাম চলছে। মাইকে ঘাটের ওপরের মন্দির থেকে ভজন গান নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে মানুষে ভরে গেল গোটা ঘাটটা। আমার দু' দিকে ঘাটের রানায় আরো অনেকে এসে বসেছে। কানে এল কে যেন কাকে বলছে—ও দিদি, এ মাসের টাকাটা এসেছে?

প্রশ্ন যার সে বিধবা, যাকে করা সেও। থুত্থুরে দুই বুড়ী। ছেঁড়া ময়লা থানের ওপর একটা করে সুতির চাদর গায়ে জড়ানো। আমার ডান দিক থেকে উত্তর উঠল—পিওন টাকা এনেছিল। এবারও ওকে দু' টাকা দিতে হল, তবে পেনসন পেলাম।

একটু অবাক লাগল—কিসের পেনসন? ডান দিকের বৃদ্ধাকে সেই প্রশ্নই করলাম—মা, আপনি তো বাঙালী। কোন সরকারী কাজ কি করতেন?

দন্তহীন, অসংখ্য ভাঁজে মোড়া অসহায় মুখটি হেসে বলল—না বাবা। আমি এখানকার বাবু-বাড়িতে রান্না করি। আর এখানকার গবমেণ্ট বুড়ী বিধবা বলে মাসে চল্লিশটা টাকা দেয় পেনসন।

চব্বিশ পরগনার জয়নগরে শিশিরবালা দেবীর ভালই বিয়ে হয়েছিল। স্বামী নুটুবিহারী কাজ করতেন খড়দার এক জুট মিলে। দেড়শ টাকা মাইনে। এক ছেলে। এমন সময় কলেরায় নুটুবিহারী গেলেন মারা। তখন শিশিরবালার বয়স পঁয়ত্রিশ। দেশ স্বাধীন হয় নি। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে টিঁকতে পারলেন না। দশ বছরের ছেলে শ্যামলকে নিয়ে যশোরে চাঁচড়ায় বাপের বাড়িতে ফিরে গেলেন। তারপর দেশ বিভাগ। শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফরম।

আবার শ্বশুরের ভিটে। শ্যামল বড় হল। চটকলের সাহেবকে ধরে শ্যামলের একটা চাকরিও হল। ছেলের বিয়ে দিলেন। আর তখনই বিরোধের শুরু। ছেলের বৌ-এর চোখে শিশিরবালা মৃত নুটুবিহারীর ব্রাহ্মণী, মা নন। রোজ বাড়িতে অশান্তি। তখন ছেলেই একদিন মাকে এনে রেখে গেল কাশীতে। ষোল-সতেরো বছর আগের কথা। বংশীগলিতে আড়াই টাকা ভাড়ায় একখানা ঘর। মাস গেলে ছেলের মনি-অরডারে পাঠানো চল্লিশটা টাকা। প্রথম বছরটা ঠিকমত টাকা আসত। দ্বিতীয় বছর থেকে শুরু হল অনিয়ম। তৃতীয় বছর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। চিঠির পর চিঠি পাঠিয়েছেন শিশিরবালা —কোন জবাব আসে নি। শেষে ষাট বছর বয়সে দশাশ্বমেধ ঘাটের পুরোনো মুখার্জী পরিবারে রাঁধুনীর কাজ নিতে বাধ্য হলেন। মাসে মাইনে দশ টাকা। বছরে তিনটে থান, তিনটে সেমিজ। সকালে জলখাবার এক কাপ চা আর দুটি রুটি।

মুখার্জী বাড়ির কাজের জন্য বংশীগলির ঘর ছেড়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে বাঙালী টোলায় কেবল গলিতে ঘর ভাড়া নিয়েছেন। জল, বাতাস, আলোহীন গুহার মত ওই ঘরের ভাড়া দশ টাকা। দোতলা বাড়ির একতলায় ও রকম চারটি ঘরে থাকেন শিশিরবালা ছাড়া আরো দুই আত্মীয়-স্বজনহীন বিধবা। চতুর্থ ঘরের বাসিন্দা এক বদ্ধ উন্মাদ রিটায়ারড বাঙালী পোস্ট-মাস্টার।

ইউ. পি. গভর্নমেণ্ট সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধদের মাসে চল্লিশটা টাকা পেনসন দেন। সেই পেনসন এখন প্রধান সম্বল পঁচাত্তর বছরের শিশিরবালার। তবে পিওন প্রতি মাসে দু' টাকা কমিশন কেটে নেবেই।

সারাটা সকাল কাটে মুখার্জীদের রান্নাঘরে। চোখে ভাল দেখতে পান না। আজকাল থেকে থেকে মাথা ঘোরে। কি যে হয়েছে, বুঝতে পারে না। ডাক্তার দেখানোর সামর্থ্যটুকু নেই।

তাকিয়ে দেখি গোটা ঘাটটা ভরে গিয়েছে অগুন্তি শিশিরবালায়।

বিকেল ফুরোনোর আগেই শীতের সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে নৌকায়, বজরায়, ঘাটের ফুলুরি-ফুচকার দোকানে হ্যারিকেন, গ্যাস-লাইট জ্বলে উঠেছে। ঘাটের গায়ে কয়েকজন স্নান করছে। তাদের গায়ের পাশ দিয়েই বেতের টুকরিতে পঞ্চপ্রদীপ ভাসাচ্ছেন মহিলারা। কার মঙ্গল কামনায় কে জানে? শিশিরবালারা কী কারো মঙ্গল কামনা করেন? এদের মঙ্গল কী কেউ কামনা করে? নাকি এদের কথা সবাই ভুলে গেছে?

এবার উঠতে হবে। আর ঘণ্টা দুয়েক বাদেই আমার ট্রেন। উঠতে যাব, কানে এল—বাবা একটা কথা বলব?—বড সংকোচ, বড দ্বিধা এই প্রশ্নে।

বললাম—বলুন।

আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন—তুমি তো বাবা কলকাতা যাচ্ছ। আমার ছেলে শ্যামল অনেকদিন চিঠি দেয না। একটু খোঁজখবর নিয়ে আমাকে একটা চিঠি দেবে?

—ঠিকানাটা দিন। আমি গিয়েই খোঁজ নিয়ে আপনাকে চিঠি দেব।

হাসিতে উদ্ভাসিত বৃদ্ধার মুখ। আবার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—১৯/১৭, কেবল গলি, বাঙালীটোলা, বারাণসী।

—এ তো মা আপনার ঠিকানা। ছেলের ঠিকানাটা দিন।

—বাহ্ বোকা পোলাপান। এই যে বললাম, শ্যামল ওর বাবার কলে খড়দা চটকলে কাজ করে। বাড়ি নিশ্চয় পাল্টেছে। নইলে অত চিঠি লিখলাম ওই ঠিকানায়, একটাও জবাব দিলে না। আমার শ্যামল তেমন ছেলে নয়। তুমি বাবা ওই চটকলেই খোঁজ নিও।

ছেলের বর্তমান ঠিকানাটা শিশিরবালা জানেন না। বহু দুঃখ বহু কষ্ট পঁচাত্তর বছরের একমাত্র সঞ্চয়। তাঁর ধারণা, খড়দা চটকলে তাঁর ছেলের নাম করলেই সবাই চিনে ফেলবে। তা যে অসম্ভব, বৃদ্ধাকে বলে লাভ নেই। বললেও বুঝতে পারবেন না। ভাববেন, খোঁজা-

খুঁজির কষ্ট এড়ানোর জন্য বুঝি অজুহাত খুঁজছি। তাই বললাম—ঠিক আছে মা, ওতেই চলবে।

—চিঠি দিও কিন্তু বাবা।

—দেব মা।

কাশী থেকে প্রায় এক বছর হল কলকাতায় ফিরে এসেছি। শিশিরবালা দেবীকে আজও চিঠি দেওয়া হয় নি। খড়দা চটকলে খোঁজ নিতে গিয়ে বুঝেছি, এর চেয়ে খড়ের গাদায় আলপিন খুঁজে বার করা অনেক সহজ।

শ্যামলবাবু, যদি এই লেখা আপনার চোখে পড়ে, দয়া করে মাকে একটা চিঠি দেবেন। জানি না এতদিন পরে আপনার চিঠির অপেক্ষায় কেবল গলির অন্ধকার গুহায় কোন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী আর অপেক্ষা করছেন কি না! বারাণসী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা হয়েছে। কিন্তু যে বৃদ্ধাদের আমি দেখে এসেছি, তাঁরা কেউই স্বেচ্ছায় এ জীবন বেছে নেন নি। তাঁরা নির্বাসিতা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুনীর জন্যও দেখেছি বিকেলবেলা আলিপুর সেনট্রাল জেলের গেটে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এসে ভিড় করেন। চিঠি প্রায় সকলেই পান। কিন্তু বার্ধক্যে বারাণসীতে নির্বাসিতা এই বৃদ্ধাদের জন্য একটি পোস্টকার্ড খরচ করার মত অনুকম্পাও কি আমাদের নেই?

সেদিন ট্রেনটা সাড়ে সাতটার অনেক পরে বারাণসী স্টেশনে এসেছিল। একা একা প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করতে করতে ভাবছিলাম, এই ট্রেনেই যদি আবার সবাই ফিরে আসে বারাণসীতে, আবার ক্লাস শুরু হয়। আমরা সবাই হোলকার হাউসে। স্কারিয়াস, আলেকজাণ্ডার, বালচন্দ্রম, শ্রীহর্ষ, গুণ্টে, মহেশ, রমেশ। হ্যাঁ, বসন্তও ফিরে আসুক। কথা দিচ্ছি, এবার খুব ভাল ছেলের মত সব ক্লাস করব, যদি কথা দাও, —সন্ধ্যা তুমিও আসবে। ডান হাতের মণিবন্ধে সেই সকালের কালো সুতোটি এখনো শক্তভাবে জড়ানো।

—শেষ—